অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

Islamic Online Madrasha (IOM)

Subject: RAM 302(201)

Submitted To:Ustaz Abdul wahid.

Submitted by:Parvej Mahamud

Roll : 1902174201

6th semester.

Date: 25/11/2022

সূচিপত্র পৃষ্ঠা

দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব.. ৬

খ্রীষ্টানদের অপতৎপরতা ৮

যেভাবে বাংলায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার শুরু ৯

পোপের পরিকল্পনা ১০

মুসলমানের দায়িত্ব ১১

ইসলাম কাদের জন্য? ১২

আল্লাহ কাদের ? ১৩

মুহাম্মাদ সা. কাদের নবী? ১৪

কুরআন কাদের? ১৪

মুসলমান কাদের জন্য? ১৫

জালিম কে? ১৬

রাসূল ﷺএর সবচেয়ে প্রিয় সুন্নাত ১৬

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী? ১৭

ফরজে কেফায়া ১৭

বর্তমান বিধর্মীদের কাছে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে ভুল ধারনা ১৮

দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব কাদের? ১৮

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়া মানবতার দাবি ১৯

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সমস্যার সমাধান ১৯

একজন হেদায়েত প্রাপ্ত হলেও তা তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট.. ২০

দাওয়াতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও দায়ীর গুণাবলী ২০

দা’য়ীর আরো একটি বৈশিষ্ট্য ২২

নওমুসলিমদের কালেমা পড়ানোতে বিলম্ব না করা ২৪
নও মুসলিমদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ২৪
দাওয়াতি কাজ নিজের ঈমানের জন্য খুবই জরুরি ২৪
দাওয়াত হলো দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপদের একটি পথ ২৫
দাওয়াহ ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হক আদায় হয় না ২৫
দাওয়াতী কাজকে নিজের মনে না করা আখেরাতের জন্য অসম্মান ২৭

বিজয়ের জন্য একটি পথ হলো দাওয়াত ২৮
দাওয়াতকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য কি ভাবে বানাবে? ২৮
সেই জাতি যার উপাধি ছিল উত্তম জাতি ২৯
দাওয়াতের ফিকির ৩০
নবী রাসূলগণের মূল দায়িত্ব ৩১
উম্মতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য ৩২
দা'ওয়াতে অবহেলার শাস্তি ৩২
আল্লাহর শাস্তি ৩৪
শাস্তির কারণ ৩৫

শাস্তির ধরণ ৩৬
সাধারণ শাস্তি বনাম বিশেষ শাস্তি ৩৯
দুনিয়াবী গযব ৩৯
দো'আ কবুল না হওয়া ৪০
সামাজিক শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া ৪০
পাপ ও অভিশাপ অর্জন ৪১
শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় ৪২
দা'ওয়াতের ফযীলত ও সাওয়াব ৪৪
সাধারণ সাওয়াব ও বিশেষ সাওয়াব ৪৪
সফলতা ও সর্বোচ্চ পুরস্কার ৪৪
অগণিত মানুষের সমপরিমাণ সাওয়াব ৪৫
আযাব-গযব থেকে রক্ষা ৪৫

দাওয়াত সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৪৬

ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعرين اما بعد

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দ্বীনকে, তাঁর সত্য ধর্মকে এই দুনিয়ায় কীভাবে জিন্দা রাখা যায় তার চিন্তা-ফিকিরের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু বান্দাকে এই ব্যাপারে নিয়োজিত রেখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে যারা শত ব্যস্ততা ও প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও এ দাওয়াতের কাজ সামনে নিয়ে মাঠে নেমেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বান্দাদের কবুল করুন, আমীন।

এই দেশে মুসলমান ছাড়াও আরও অনেক ধর্মের লোকের বাস। আমরা সাধারণত তাদেরকে বিধর্মী বা অমুসলিম বলি। যেমন ইহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ। এদেশে এদের সংখ্যা ১০%, যার ভেতর খ্রীষ্টানরা বড় একটা অংশ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এ সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। কিভাবে তাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল? কারণ, আমরা এদের কাছে সত্যের দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছি না, ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরছি না। শুধু সমালোচনা করে যাচ্ছি, শুধু গালি দিয়ে যাচ্ছি। সংশোধনের পথের কথা কখনো আমরা তাদেরকে বলছি কি? আমাদের অনুধাবন করতে হবে, তারাও তো আমাদেরই ভাই, আমাদেরই বোন, এক আদমের সন্তান, এক আদমের বংশধর, আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মাখলুক। শয়তান তাকে ধোঁকায় ফেলে দোজখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হায়। আমার বোন, আমার ভাই আজকে সত্য না-জানার কারণে হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে দোজখের সেই লেলিহান আগুনের দিকে চলে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন- "শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" আর সেই শত্রুই আমার ভাই ও আমার বোনদেরকে নিয়ে যাচ্ছে নিজের কোলে, আর আমি এগিয়ে যাব না বা আমি সত্য জানাবো না এবং শয়তানদের খপ্পড় থেকে তাদের উদ্ধার করব না- তা কি হয়? তাহলে তো আমার ভেতর মানবতা বলতে কিছুই থাকলো না।

এ যুগে নবী আসবেন না, রাসূল আসবেন না। দাওয়াতের এই কাজ তাহলে কে করবে? এই উম্মতকেই এই দাওয়াতের কাজ করতে হবে, যদি দাওয়াতের কাজ না করা হয়- তাহলে কি এর জন্য আমাকে আল্লাহর কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না? অবশ্যই হতে হবে। কারণ এই কাজটা সবার। আমাদের দায়িত্ব শুধু একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

সকল প্রশংসা মাত্রই জগতসমূহের রব মহান আল্লাহর জন্য, যার প্রদত্ত তাওফীকে **"অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত"** নামক এসাইনমেন্টটি সম্পন্ন হয়েছে। রচনাটিতে বিভিন্ন উলামাদের বই-পুস্তক থেকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ এ কাজ করিয়েছেন। এই কাজ করতে আমার যে ভুল ত্রুটি হয়েছে সেগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۶۲﴾

"নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।"[1]

দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব[2]

বদরের ময়দানে দাঁড়িয়ে গেছে ৩১৩ জন ঈমানদৃপ্ত আল্লাহভীরু মুসলমান সাহাবী। আল্লাহর কাছে বদরের যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করেছেন, আল্লাহ! এই যে ৩১৩ জন, এরা নিরস্ত্র আর অপর পক্ষে ১০০০ সকলেই সশস্ত্র, তুমি যদি আজকে এদেরকে ধ্বংস করে দাও, তবে দুনিয়ায় মানুষ থাকবে, কিন্তু তোমার নাম নেওয়ার, তোমার এবাদত করার কোন লোক থাকবে না। অথচ তুমি তোমার কালামের মধ্যে বলেছ, "আমি এই দুনিয়ায় মানুষকে পাঠিয়েছি আমার এবাদত করার জন্য"। এই ৩১৩ জনকে তুমি আজকে ধ্বংস করে দিলে তোমার দ্বীন প্রচার করার আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এরাই আছে তোমার দিন এই দুনিয়ায় টিকিয়ে রাখার জন্য, আল্লাহ তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করলেন। তাদেরকে আল্লাহ ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করলেন এবং এই ১০০০ সশস্ত্র যোদ্ধার বিরুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলমানকে বিজয়ী করলেন। আল্লাহ তার দাঈদেরকে এভাবেই সাহায্য করেন।

---

[1] (সূরা আল আন'আম, আয়াত-১৬২)

[2] সত্যের দাওয়াত পৃ:না - ১৫ (দাঈ মুশফিকুর রহমান)

মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন গোত্রে, বিভিন্ন ভাষা ভাষী ও জাতী-গোষ্ঠির নিকট পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। ধীরে ধীরে দুনিয়ায় মানুষ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই অনুপাতে বিভিন্ন গোষ্ঠির কাছে আল্লাহ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আমরা জানি একই সময় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী বা পয়গাম্বর। আল্লাহ তাআলা তার সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۶۷﴾

“ হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চই আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।[3]

আল্লাহ তা’আলা মুহাম্মদ ﷺ এর মাধ্যমে নবী রাসুল পাঠানোর ধারাবাহিকতা বন্ধ করে নিয়েছেন। নবীজীর উম্মতের উপর এই দাওয়াতের গুরু দায়িত্বভার দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় ভাষণে এই কথাই বলেছেন তোমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছাতে পেরেছি? সাহাবাগণ সমস্বরে বললেন, জি হ্যাঁ, আপনি পৌঁছিয়েছেন। নবীজী আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বললেন, আল্লাহ। আপনি সাক্ষী থাকুন আমি আমার উম্মতের কাছে দ্বীন পৌঁছাতে পেরেছি এরপর আল্লাহর রাসূল যারা উপস্থিত ছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তোমরা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। যারা উপস্থিত অনুপস্থিতদের কাছে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ

আল্লাহ তাআলা বলেন-, **“তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও আর অসৎকাজ হতে নিষেধ করো এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো।”**[4]

আল্লাহ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে আমি সর্বোত্তম জাতি করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছি। তোমাদেরকে আমি বের করেছি, তোমরা বের হওনি। কিসের জন্য তোমাদের আমি বের করেছি, তোমরা দামী। কারণ তোমাদের দ্বারা আমি দাওয়াতের এই দামী কাজ করাবো। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে।

যখন গুনাহগারদের জাহান্নামের দিকে নেওয়া হবে, তখন জাহান্নামের রক্ষীরা বলবে-তোমাদের কাছে কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসে নাই? বলুন, এই যুগে যারা বিধর্মী তাদের কাছে কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসবে? আলেম সমাজ হলেন “ওয়ারাতুল আম্বীয়া”তারা নবী রাসূলগণের উত্তরসূরী। নবীগণের প্রধান কাজই ছিল দাওয়াত, আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত (আল্লাহ বলেন, “নিশ্চই শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ”। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন – “নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে তার সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। ”[5]

এই যে যারা আল্লাহর সাথে শরীক করছে তারা কি ভাল কাজ করছে? সবচাইতে বড় গুনাহর কাজ করছে, তাদেরকে সাবধান করা কি আমাদের কাজের মধ্যে পড়ে না? আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- “তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকাজ করে এবং বলে আমি একজন আজ্ঞাবহ”। সবচাইতে উত্তম ও ভাল কাজ মানুষকে একাত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া। তাই দাওয়াতের এই কাজকে আপনি ফরযে কেফায়া বলবেন নাকি ফরযে আইন বলবেন? যাই বলেন, এই কাজ যে আমাদের করতে হবে এতে আমরা একমত। আল্লাহর পক্ষ থেকেই হউক আর নবীর পক্ষ থেকেই হউক, চাই মানবতারই হউক এই কাজ আমাদের করতে হবে।

আমরা মুসলমান। কোন রূপ দরখাস্ত ছাড়াই আল্লাহ সুবহানাতা'আলা আমাদেরকে মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছেন, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিরাট একটা নেয়ামত। আমরা আল্লাহর একাত্ববাদে বিশ্বাস করি। যারা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করবে, তার নবীদের বিশ্বাস

---

[3] সুরা মায়েদা আয়াত-৬৭

[4] সুরা ইমরান-১১০

[5] সূরা নিসা আয়াত নং-১১৬

করবে, ফেরেশতাদের বিশ্বাস করবে, কিতাবসমূহ বিশ্বাস করবে, কিয়ামতে বিশ্বাস করবে, শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করবে, তকদিরকে বিশ্বাস করবে অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে তারা যদি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর হুকুম পালন না-ও করে, তার অপরাধের জন্য দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর একদিন না একদিন সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যে লোকটি মুসলমান নয়, এক আল্লাহ ছাড়া বিভিন্ন দেব দেবির উপাসনা করে, অথবা এক আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে তার সমকক্ষ মনে করে তাকেও আরেক ঈশ্বর বলে মানে, আল্লাহকে একমাত্র মালিক বলে বিশ্বাস করেনি, আল্লাহর সাথে কোনো না কোনোভাবে শরিক বানিয়েছে, তাদের কী হবে?
আল্লাহতা'আলা বলেন,

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿۱۱۶﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে তার সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।" [6]

আসলে তারা আল্লাহর সাথে শিরিক করার দরুন চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ ۟

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালার নিকট গ্রহণযোগ্য জীন একমাত্র ইসলাম।"[7]

আদম সন্তান যখন তার মায়ের পেট থেকে বের হয়ে পৃথিবীর বুকে আসে, তখন সে একজন মুসলমান হিসাবেই জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু পরবর্তীতে তার পিতা মাতা এবং তার পরিবেশ তাকে শিরক করা শিক্ষা দেয়।

মুসলমান মানে কি? তার সৃষ্টিকর্তার সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, তার হুকুমগুলো বিনা শর্তে পালন করা।

এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এক আদমের বংশধর। সে হিসাবে বিধর্মীরা কি আমার-আপনার ভাই নয়? আমার-আপনার ভাই নিশ্চিত চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে পুড়বে এবং সেটা আমি-আপনি জানি, তারপরও তাকে ফেরানোর কোন দায়-দায়িত্ব কি আমাদের নেই? তাদের কাছে দাওয়াত কে পৌঁছাবে? তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো কি আমাদের দায়িত্ব নয়?

আমার পাশের বাড়িতে আজ মেহমানদারি চলছে আমি জানি, আমার কানে খবরও এসেছে, ঘ্রাণও পাচ্ছি। কিন্তু আমি তাতে অংশগ্রহণ করতে পারব না। কারণ আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। ঠিক তেমনি অমুসলিমরাও ইসলাম, মুসলিম, কুরআন, বেহেশত, দোজখ সম্পর্কে কিছু কিছু জানে, কিন্তু যেহেতু তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি, তাই তারা ইসলামের ছায়াতলে সংকোচ বোধ নিয়ে আসতে পারছে না। সুতরাং দাওয়াত দেওয়া জরুরি। তা-না হলে এরাই আপনাকে-আমাকে হাশরের ময়দানে বিচারের কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে দাঁড় করাবে। তারা বলবে, "হে আল্লাহ্! ৯০% মুসলমানের দেশে বাস করতাম কোন মুসলমান ভাইতো আমাকে তোমার সত্য দ্বীনের কথা বলে নাই, এই মুসলমান ভাই আমার প্রতিবেশী ছিল, কিন্তু সে আমাকে কোন দিন ইসলামের সৌন্দর্যের কথা সুন্দরভাবে তুলে বুঝিয়ে বলেনি। সে বললে হয়ত ইসলামের ছায়াতলে চলে আসতাম। এভাবেই তখন তারা আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবে।

আমার প্রতিবেশী ভাই আজকে অন্য ধর্ম অবলম্বনের দরুন জাহান্নামের আগুনের দিকে চলছে। সেই প্রতিবেশী আমারই ভাই এবং আমারই বোন হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে একটি বারের জন্যও আমি সতর্ক করিনি। যদিও আমরা বাস্তবে দেখি পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে প্রতিবেশী তার আত্মীয় হোক আর না হোক, মুসলমান হোক আর না হোক- প্রতিবেশী ছুটে যায় আগুন নেভানোর জন্য। প্রতিবেশী তখন সেদিকে তাকায় না যে সে মুসলমান না হিন্দু, না খ্রীষ্টান, আত্মীয় নাকি অনাত্মীয়, আজকে আমার সামনে যদি কেউ পানিতে পড়ে আমি ছুটে যাব তাকে পানি থেকে উদ্ধারের জন্য। অথচ আজকে সেই প্রতিবেশী বিধর্মী ভাইয়ের সাথে আমার হর- হামেশাই দেখা হচ্ছে, আলাপ আলোচনা হচ্ছে, তার সাথে লেনদেন হচ্ছে, ভাল মন্দের সমস্ত কিছুই তার সাথে আলোচনা করছি, কিন্তু এই ব্যক্তিটাই যে মৃত্যুর পর ইসলাম গ্রহণ না করার দরুন চিরজাহান্নামি হচ্ছে, চিরকাল লেলিহান আগুনে জ্বলবে আর কঠিন শাস্তি ভোগ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি, এই কথাটা একটি বার কি তাকে বলেছি? এটাকি প্রতিবেশীর হক নয়? আমি কি প্রতিবেশির হক আদায় করলাম? তাকে কি সত্য ধর্মের দাওয়াত দেওয়া আমার দায়িত্ব নয়? তার জন্য কি আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করবেন না বা সে সেই কঠিন সময় আল্লাহ কিংবা সেই প্রতিবেশি কি আমাকে দায়ী

[6] নিসা-১১৬

[7] ইমরান-১৯

করবে না? তা হলেতো আমার ভিতর মানবতা বলতে কিছুই রইলো না, মানবিক দিক দিয়ে হলেও তো এই আমাকে সেই বিধর্মী ভাইকে দাওয়াত দিতে হবে। সুতরাং দাওয়াত দেওয়াটা জরুরী এবং দাওয়াতের এই কাজ আমাদেরই করতে হবে।

এক জাহাজে কোন এক ব্যক্তির কলেরা হয়েছে, কিন্তু ডাক্তার এই ব্যক্তির চিকিৎসা করবে না, কিছুদিন পর এই কলেরা রোগীর কারণে জাহাজের কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে, বলুন এর পরও যদি ডাক্তার সাহেব চুপ করে বসে থাকে তবে কি সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হবে না? বর্তমানে উপজাতি প্রায় সকলেই খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। এখন কোন কোন এলাকায় প্রান্তিক মুসলমানরাও হচ্ছে। সুতরাং এই কাজ আমাদের এখনই শুরু করতে হবে, তা না হলে সকলের ঘরকেই এক সময় এই রোগে আক্রান্ত করবে।

খ্রীষ্টানদের অপতৎপরতা [৪]

বাংলায় ইংরেজ শাসনের আগে দু'একটি এলাকায় হাতে গোনা কতজন পর্তুগিজ ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কোন খ্রীষ্টান ছিল বলে আমার জানা নেই। বস্তুত ইংরেজ শাসনের আমলেই বাংলায় এ ধর্মটি বিস্তার লাভ করে এবং বিভিন্ন এলাকায় খ্রীষ্টানরা স্থাপনা তৈরি করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আবার তারা সক্রিয় হয়ে উঠে এবং প্রকাশ্য প্রচারকার্য চালনা করা শুরু করে। মাঠে ময়দানে ঘুরলে দেখা যায় ইদানীং তাদের এ কাজ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ধারণ করেছে। প্রথম তারা হিন্দুদের মধ্যে ও উপজাতিদের কাছে প্রচার করেছে, এখন তারা মুসলমানদের কাছে প্রচার শুরু করেছে, এমন কি তারা কুরআনের ভুল ব্যখ্যা দিয়ে মুসলমানদেরকে তাদের দিকে নিচ্ছে, খ্রীষ্টানরা দলবদ্ধভাবে, জামাত বেঁধে প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজে নেমে গেছে। তারা বলছে মুক্তি পেতে চাইলে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। তারা কুরআন থেকে আয়াত বলে মুসলমানদের খ্রীষ্টান বানাচ্ছে, শুনতে আবাক লাগে কিন্তু ঘটনা সত্য। আজকে তারা প্রত্যন্ত এলাকায় শত শত একর ভূমি, নামে বে-নামে কিনে নিচ্ছে বেশি মূল্য দিয়ে। সেখানে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ছে যেমন হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ। সাহায্যের নামে ঋণ দেওয়ার কার্যালয় ও উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করছে। দেখে মনে হয় সবই ভাল কাজ, উন্নয়নমূলক কাজ, কিন্তু একটু ভিতরে গিয়ে দেখলে দেখা যায় তাদের প্রকৃত চেহারা, তারা উন্নয়নের নামে এ কি গভীর চক্রান্তে তারা লিপ্ত। তাদের হাসপাতাল গুলোতে ওয়েটিং রুম আছে, সেখানে বসিয়ে খ্রীষ্টনিজমের ছবি দেখানো হয়, বাইবেলের বা কিতাবুল মুকাদ্দাছের তালিম করা হয়। মোট কথা, সহজ সরল মানুষগুলোকে তাদের সংস্পর্শে এনে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। তাদের স্কুল কলেজগুলোতে বাইবেল পড়ানো হচ্ছে, ছোট ছোট বাচ্চাদের খাবার খাওয়াচ্ছে। যীশুর নামে সমস্ত কাজ শুরু করতে শিখাচ্ছে। তারা যীশুর নামে প্রার্থনা করছে। এই বাচ্চারা যীশুকে চিনে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না, অথচ তারা মুসলমানের সন্তান, ইচ্ছা করলেও তারা ইসলাম শিখতে পারছে না। এভাবে ছোট থেকেই তাদেরকে যীশু প্রিয়, খ্রীষ্টান হওয়ার প্রবণতা গড়ে তুলে।বিভিন্ন জায়গায় তাদের স্পনসরসিপ নামে প্রোগ্রাম আছে, সেখানে তারা মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় সেই বাচ্চার সকল দায়িত্ব নিয়ে নেয়। বাচ্চার খাবার, মায়ের খাবার এবং সংসারে তার কি প্রয়োজন সেই খরচসহ বহন করে এবং এই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর তার সকল খরচ তারা বহন করে। এভাবেই তারা বাচ্চাদেরকে খ্রীষ্টান বানায়। অর্থ সাহায্য দিয়ে খ্রীষ্টান প্রচারকরা তাদের বাড়িতে যাওয়ার একটা রাস্তা করে ফেলে এবং আস্তে আস্তে তাকে খ্রীষ্টান বানায়। মুসলমান এলাকায় তারা গীর্জা বানায়, সহজ সরল মানুষকে বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে, ধর্ম গ্রন্থের অপব্যাখ্যা দিয়ে, ভুল বুঝিয়ে খ্রীষ্টান বানাচ্ছে। যারা কুরআনের ধারক বাহক আজকে তারা এই কাজ থেকে দূরে আছে বলেই খ্রীষ্টানরা কুরআনের ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করেছে। সুতরাং কুরআনের এই সত্য বাণীকে আলেম সমাজেরই এগিয়ে আসতে হবে মানুষের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য, ভালোভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, সুন্দরভাবে বুঝানোর জন্য, তাহলেই আমরা সফল হবো। আমাদের ঘরকেও বাঁচাতে পারবো ইন শা আল্লাহ।

বৃটিশরা এ দেশ থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে বটে কিন্তু তারা বসে নেই, তারা বুঝতে পেরেছে যে, এই দেশকে আমরা অস্ত্রের মুখে দাবিয়ে রাখতে পারবো না। কিন্তু এ দেশকে কিভাবে হাতে রাখা যায় তার পথ তারা খুঁজে পেয়েছে। তারা এই দেশের কোমলমনা সন্তানদের বৃত্তি দিয়ে তাদের দেশে নিয়ে তাদের কালচার শিখিয়ে আবার নিজ দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সে যেন এই দেশে এসে তাদের শিখানো কালচার আমাদের দেশে বাস্তবায়ন করে এবং এভাবেই তারা আমাদের দেশকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারবে, তাহলে তাদের চিন্তা চেতনাকে এই দেশে বাস্তবায়নে তাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। এদেরকেই সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসিয়ে তাদের কার্য হাসিল করবে। আজকে খ্রীষ্টানরা সারা বাংলাদেশে তাদের এই কার্যক্রম চালাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশের এই ভৌগলিক সীমারেখা ঠিক রাখা যাবে না। অচিরেই এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। সুতরাং ভৌগলিক সীমারেখা ঠিক রাখার জন্য হলেও আমাদের এই দাওয়াতের কাজ চালু রাখতে হবে, যেন মুসলমানরাও ঠিক থাকে এবং তার সাথে সাথে অন্যরাও মুসলমানদের ছায়ার নিচে চলে আসে।

মিশনারিদের প্রধান টার্গেট হলো, এই লোকগুলোকে আমরা আমাদের দলে নিয়ে আসি তা যেভাবেই হউক। মুসলমানদের বলছে ঈসা মুসলিম। গারোদের বলছে পারো খ্রীষ্টান, মূল কথা, তারা চাচ্ছে যে যা পালন করুক, তারা যেন আমাদের দলে থাকে। তারা জানে মদ

---

[৪] সত্যের দাওয়াত পৃ:না – ২০ (দাঈ মুশফিকুর রহমান)

খাওয়া জুয়া খেলা, জিনা করা, সুদ খাওয়া, শুকর খাওয়া, মূর্তি পূজা ইত্যাদি নিষেধ তবুও করছে, তারাতো পুজি মানুষকে তাদের দলে ভিড়াতে চাচ্ছে। তারা নিজেরাও জানে তাদের এই খ্রীষ্টধর্ম একটা বাতিল ধর্ম। ব্যাকডেটেট ধর্ম। সর্বশেষ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাব বা ফাইনাল যে কিতাব আল কুরআান এটা তারা জানে কিন্তু স্বীকার করলে তো তাদের বড়ত্ব, বাহাদুরী, মাতাপুরী চলবে না, বা তা মুসলমানদের হাতে চলে যাবে। যার জন্য তারা সত্য জানার পরও ইসলামকে স্বীকার করতে পারছে না।

দেখে মনে হচ্ছে, তারা চারিদিক দিয়ে মুসলমাদেরকে টার্গেটে পরিণত করেছে এবং তারা যেভাবে পাচ্ছে সেভাবেই ঈশ্বর-রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজের অংশ হিসেবে নালিতাবাড়ি, শেরপুর, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা, হালুয়াঘাট, ফুলপুর, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, মধুপুর, বৃহত্তর ময়মনসিংহের বর্ডার এলাকার প্রায় সমস্ত আদিবাসীদেরই তারা খ্রীষ্টান বানিয়ে ফেলেছে। আজকে এই চিত্র সারা বাংলাদেশ ধরেই চলছে, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, যশোর, দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারি, রৌমারী, লালমনির হাট, ঠাকুরগাঁ, সমস্ত উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশের বিশাল চড় এলাকাগুলোতে তারা কাজ করে তাদেরকে খ্রীষ্টান বানাচ্ছে, গাজীপুর ও ঢাকায় এ রকম বহু এলাকায় তারা তাদের এক বা একাধিক মজবুত ঘাটি তৈরি করে ফেলেছে। এদেশের গাড়, হাজং, শাওতালদের এবং সমস্ত উপজাতিদের প্রায় ৯৫% সদস্য খ্রীষ্টানদের ধর্মে চলে গেছে, পার্বত্য এলাকাকে তারা খ্রীষ্টান রাজ্য বানানোর চিন্তায় আছে। এরকম আরো অনেক এলাকায় তারা শত বছর আগে থেকেই তাদের কার্যক্রম চালু করেছে, এটা আমাদেরই কমতি। আমরা উপজাতি ও পাহাড়িদের কাছে যাই না, দাওয়াত দিই না, অবহেলা করি, অনীহাভাব, পোষণ করি, তাদেরকে ছোট ভাবি। আমাদের এই কমতি দূর করতে হবে। পাহাড়িসহ বিভিন্ন অবহেলিত গোষ্ঠীর কাছে যেতে হবে, ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে। তাহলে সেখানেও সুখের চিত্র পাব।

তাদের কিতাবে হাজার ভুল তারা নিজেরাই স্বীকার করছে, বিভিন্ন লেখক নিজের হাতে বিভিন্ন ভাবে লিখেছে তা জানার পরও তারা এটাকে ধরে আছে শুধু সম্মানের ভয়ে। এই কিতাব তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না, তা জানার পরও সে ছাড়তে পারছে না। মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে কি পারবে না; তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই, এইভাবে তারা তাদের দল ভারি করছে খুব গোপনে। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ঘুরলে দেখা যায়, মুসলমান দলে দলে খ্রীষ্টান হয় অর্থের লোভে, নয় নিজ ধর্মের অজ্ঞতার জন্যে। কে ফিরাবে তাদেরকে? কে এদের দায়িত্ব নিবে? সরকারের যেরূপ এই দিকে খেয়াল দিতে হবে, তদ্রুপ আলেম সমাজেরও বিশাল একটা ভূমিকা আছে এই নিজ ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞলোকগুলোকে বুঝানোর ।

যেভাবে বাংলায় খ্রীষ্টধর্মের প্রচার শুরু হলো [9]

“এই বঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম কিভাবে প্রচার শুরু হল" নামে তাদেরই প্রকাশিত বই থেকে জানা যায় ১৫ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই উপমহাদেশে পর্তুগিজরা আসা শুরু হয় এবং ১৭৪০ সাল থেকেই এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার কাজ শুরু হয়। বাণিজ্য করতে এসে পুর্তুগিজরা ও ইংরেজরা এই দেশ শাসন করে এবং এই শাসকদের সহযোগিতায় শুরু হয় মিশনারী কাজ। সুইডেন দেশীয় জনজ্যাকারিয়া করনেন্ডার বহু কষ্ট করে প্রথম এ কাজ শুরু করেন। প্রথম প্রথম গভমেন্টের সহযোগিতা না পেয়ে তিনি প্রথমত প্রচারকার্যে তেমন সফল হতে পারেননি। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ তাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন মিশন স্থাপন করার জন্য। ১৭৬১ সালে করনেন্ডার একটা স্কুল ও ধর্ম শালা তৈরি করেন এবং ১৭৭০ সালে তিনি। বড় করে উপসনালয় নির্মাণ করেন এবং সেই ঘর গির্জা হিসেবে বাংলায়। পরিচিত হয়। গির্জাটির বাইরের দেওয়াল লাল রং-এর ছিল বলে তাকে লাল গির্জা বলা হত। তার প্রচারকার্যের প্রথম ফসল একজন রোমান ও একজন ব্রাহ্মণ। ১৭৮১ সালে তিনি ৮জন মুসলমানকেও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। পরবর্তীতে কারনেন্ডারের সাথে আরও অনেকে যোগ দেন। তাদের মধ্যে ডব্লিউ এইচ কেরীর নাম প্রসিদ্ধ এবং তার সাথে জনটমাস বাংলায় খ্রীষ্টরাজ্য স্থাপনের ক্ষেত্রে সাথে অনেক পরিশ্রম করেছেন। টমাস ছিলেন চিকিৎসক, ১৭৮৩ সালে টমাস চিকিৎসক হিসেবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজে এই বাংলায় আসেন। টমাস সাহেব ১৭৮৩ সালে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার কাজে 'ইন্ডিয়া গেজেট" নামক পরে এ মনে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যে, "বঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পরিকল্পনা হচ্ছে। যারা এ কার্যে সহযোগিতা করতে চান তারা যেন পত্রিকার সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করেন। ১৭৮৭ সালে তিনি বাংলায় পড়তে ও লিখতে শুরু করেন। কেরী এ সময় বিলেতে বাপ্তিষ্ট সম্প্রদায়কে উৎসাহ প্রদান করার উদ্যোগ নেন যেন বিদেশে খ্রীষ্টীয় প্রচারে তারা উৎসাহী হন। তিনি এ সময়

[9] সত্যের দাওয়াত পৃ:না – ৬৪ (দাঈ মুশফিকুর রহমান)

'দেবপূজকগণের মন পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে খ্রীষ্টানরা বাধ্য কিনা'', না সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এভাবে তিনি অনেককে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য এবং সাহায্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। টমাস সাহেব এ সময় আদি পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করেন।

টমাস ও কেরী যখন এ বাংলায় আসেন তখন গর্ভনমেন্ট বাংলার ভূমিতে খ্রীষ্টীয় কার্যের ভয়াবহ বিরোধী ছিলেন এবং তাদেরকে অর্থের অভাবে বহু কষ্ট করতে হয়। অর্থের অভাবে কেরী সাহেব শহর ছেড়ে সুন্দরবনে স্বপরিবারে চলে যান। পরে টমাস সাহেব অর্থের অভাবে চিকিৎসা বিদ্যার চর্চা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি নীল কুঠিতে চাকরি নেন এবং তার চেষ্টায় কেরীও কুঠিতে চাকরি নেন এবং বাংলা শিক্ষা, সুসমাচার প্রচার ও নিউটেস্টমেন্ট-এর বাংলা অনুবাদ শুরু করেন। রামবসু নামে এক ব্যক্তি টমাস ও কেরী সাহেবকে বাংলা শিক্ষা দেন। তাদের সাহচর্যে রামবসু ও খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মাঝে মাঝে টমাস সাহেবরা রামবসুকে ধর্মের কথা শুনালে তারা অবাক হয়ে শুনতেন। রামবসু তাদের বাইবেল ও অন্যান্ন গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ ও প্রচার কার্যে সাহায্য করতেন। রামবসু নিজেও বই রচনা করেছেন, কিন্তু তিনি এত কিছুর ভিতরে থেকেও নিজে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেননি। কৃষ্ণপাল নামক এক সূত্রধর প্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। কৃষ্ণপাল পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলে, টমাস তার চিকিৎসা করেন এবং খ্রীষ্টধর্মের দাওয়াত দেন। পরে কেরীয় তার সহযোগী মার্শমান যান তাকে দেখতে। এর পর থেকে কৃষ্ণপাল খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। এ কথা শুনে তার স্বজাতিরা তাকে তিরস্কার করতে লাগল। তারা গভর্ণরের নিকট নালিশ করলে গভর্ণর তাদেরকে বলল, কৃষ্ণপালতো ভাল কাজই করেছে, তোমরা তার অনিষ্টকরো না। গভর্ণর তার বাড়িতে সিপাহী দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করে দিলেন, যেন কেউ তার অনিষ্ট করতে না পারে। এভাবে ১৮০০ সালের ডিসেম্বর মাসে গংগায় স্থানের মাধ্যমে বাপ্তাইজ হন। তারপর তার শালীকা, স্ত্রী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এ ছিল উপমহাদেশে তথা বাংলায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের সূচনা পর্ব। এরপর পর্যায়ক্রমে দিনাজপুর, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, যশোর ও ঢাকায় প্রচার কাজের প্রসার লাভ করে। ১৮০১ সালে টমাস সাহেব মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৩৪ সালে ডব্লিউ এইচ কেরীও মৃত্যুবরণ করেন।

পোপের পরিকল্পনা [10]

মধ্যযুগ থেকে খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ সাম্রাজ্য বিস্তারকারীদের সাথে সাথে বিভিন্ন দেশে যাওয়া শুরু করেন। এভাবে তারা বাংলায় আসেন ইংরেজ শাসকদের সাথে। কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হীন ভাবপ্রকাশ করার দরুন অন্যদের কাছে 'বিদেশী' বলে বদনাম বয়ে আসে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার প্রসার কল্পে ২য় ভ্যাটিকান মহাসভায় উক্ত বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয় এবং পোপ অ-খ্রীষ্টানদের কাছে মণ্ডলীদের কার্যের পদ্ধতি বা সংলাপ কী হবে সে ব্যাপারে অধিবেশনে ভাষণ দেন এবং তাদের দিক-নির্দেশনা দেন। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার-প্রসার পথ ও পদ্ধতি বা তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার রূপ কী হবে সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে ভ্যাটিকান মহাসভায় পঞ্চদশতমী পর্ব দিনে পোপ ৬ষ্ঠ পোলাই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পূর্ণ দপ্তর প্রতিষ্ঠিত করেন। এর লক্ষ্য- - উদ্দেশ্য অ-খ্রীষ্টানদের সাথে উপযুক্ত সংলাপ শুরু করার ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করা, যাতে খ্রীষ্টান ভক্তগণ অ-খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে অকপটে এবং শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে জানতে পারে এবং অ-খ্রীষ্টানরাও যেন খ্রীষ্টীয় শিক্ষা সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় অনুকূলভাবে পরিচিত হতে পারে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। এ ব্যাপারে একটা দলিলও প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে পোপ মহোদয় অ-খ্রীষ্টানদের জন্য সচিবালয়ের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন এবং মতবিনিময় করেন। তিনি সকল খ্রীষ্টভক্তদের প্রতি আহবান রাখেন, এটা তার দায়িত্ব বলে তা সশরীরে হোক বাদানের মাধ্যমে হোক, যেখানে মণ্ডলী তৈরি হয়নি সেখানে তা প্রতিষ্ঠা করা। আর বলা হয় মণ্ডলীর কাজই হচ্ছে ঐশরাজ্য বিস্তার করা ও নর-নারীর মধ্যে ঐশ রাজ্যের মূল্যবোধ বৃদ্ধি করা। মন্ডলীর কাজের অপরিহার্য উপাদান ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মানব জাতির পক্ষে দাঁড়ানো তার সামাজিক ন্যায্যতার, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার এবং অন্যায্য।
সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের অঙ্গীকারের নামে সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মপরিকল্পনা করা হয়। তারা প্রচার কার্যে কখনও যেন মুসলমানের সাথে বাক-বিতণ্ডা ও বিরোধিতার মনোভাব না জাপায় এবং ঐশী প্রেমের গতিতে তারা প্রত্যেক মানুষের সেবায় যেন আত্মনিয়োগ করে এবং নিজেদের ও খ্রীষ্টীয় পরিচয় দেয়। ঈশ্বরের রাজ্য গঠনই সকল খ্রীষ্টের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মন্ডলীর এই যাত্রা • প্রচেষ্টা ঐশী রাজ্যেরই লক্ষে যে পর্যন্ত না একই ঈশ্বরের অধিনে ভাই- কোনরূপে সমস্ত মানবজাতি পূর্ণ মিলনের মাধ্যমে সেই রাজ্যের পূর্ণতা লাভ করে। খ্রীষ্টীয় প্রত্যেক অনুসারীকে তার নিজস্ব গুণে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু যে পরিবেশেই হোক খ্রীষ্টীয় প্রচার বাস্তবায়ন করতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক,

[10] সত্যের দাওয়াত পৃ:না – ৬৬ (দাঈ মুশফিকুর রহমান)

শিক্ষাগত, শৈল্পিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যে পরিবেশেই সে বাস বা কাজ করে মঙ্গল সমাচারের প্রচার তার করতে হবে। এর পথ ধরে আজকে বিংশ শতাব্দীতেও তারা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার ঘটিয়ে যাচ্ছে। এদেশের প্রায় প্রতিটা এনজিও তাদের মদতপুষ্ট হওয়ায় সাহায্যের নামে দলে দলে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। যেহেতু মিশনারীগুলো আন্তর্জাতিকভাবে সহযোগিতা পাচ্ছে তাই সরকার তাদেরকে কিছু না বলার দরুন প্রশাসনও তাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে।

মুসলমানে:র দায়িত্ব[11]

এই দাওয়াতের কাজটা ছিল আমাদের। মুসলমান ছিলো দাঈ জাতি কিন্তু মুসলমান তার কতব ভুলে যাওয়ার কারণে আজকে মাদউতে পরিণত হয়েছে, দাওয়াত দেওয়াই ছিলো আমাদের কাজ। আজকে আমরা এই কাজকে ছেড়ে দেওয়ায় খ্রীষ্টানরা সেই জায়গা দখল করেছে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতের পর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাফের- মুশরেকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সারা জীবনের মিশনই ছিলো পথভোলা এই মানুষগুলোকে আবার কীভাবে পথে আনা যায় ।

বলা হয় প্রচারেই প্রসার, আমরা দেখি বিভিন্ন জিনিসের প্রচারের কাজে নিয়োজিত কিছু লোক থাকে, তারা তাদের প্রতিটা আইটেমকে তার বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরে। তখন তাদের প্রচারের জন্য খারাপ জিনিসও ভাল বলে মানুষ নিয়ে নেয়। সুতরাং আমাদের আলেম সমাজ যদি আজকে কুরআনকে মানুষের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরি- এই কিতাব শুধু মুসলমানের জন্য নয়, এই কিতাব সমস্ত মানবজাতির কল্যাণে তার মালিক পাঠিয়েছেন। এটা পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন বিধান; তবে অবশ্যই সুফল আসতে বাধ্য। আলেম সমাজ বলার কারণ হলো তারা নবীর ওয়ারেস। হা কাজটা সকলের কিন্তু আলেম সমাজের অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

মানুষ কখনও ভালোটা রেখে খারাপটা গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু তাকে ভুল বোঝানোর ফলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। খ্রীষ্টান মিশনারী এদেরকে ভুল ব্যাখ্যা দেয়। তারা নিজেরাই তো ভুলের মধ্যে আছে এবং ভুলের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাদের ভুল ব্যাখ্যার কারণে বহু অসচেতন সরল মানুষ ভালোটা রেখে খারাপটা গ্রহনের পথে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে হয়ত বা বাংলায় এক সময় মুসলমানরাই হয়ে যাবে সংখ্যালঘু। মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু মুখে নিজেদের বলবে মুসলমান অথচ মাইক দিয়ে মসজিদে আওয়াজ করা যাবে না। আশঙ্কা হয়, একদিন তারা ওয়াজ-নছিহত ও মাহফিল করা বন্ধ করে দেবে। মসজিদগুলোতে শুধু নামায পড়তে ঢুকবে আর বের হবে, আর কিছুই করার সাহস মুসলমানদের থাকবে না । সেই দিন আর বেশি দূরে নয় বলেই মনে হচ্ছে। তার আলামত ইদানীং আমরা নানান দিকে দেখতে পাচ্ছি নানা ঘটনার মাধ্যমে, একটু চিন্তা করলেই আমরা তা বুঝতে পারব, আসলে সত্য কথা

আমরা আজকে এসব বিষয়ে উদাসীন, চিন্তা করার সময় আমাদের নাই। অথচ মিশনারীদের ভুল ব্যাখ্যার জাল ছিন্ন করা যে আমাদের বড় কাজ সেটাই আমরা ভুলে গেছি বা আমাদের সেটা বুঝেই আসে না। বিশিষ্ট দাঈ মুফতি যুবায়ের আহমেদ সাহেব তাঁর এক দাওয়াতী বইয়ে লেখেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতাপূর্ণ একটি বক্তব্য হচ্ছে যে, যে নেতা কেবল নিজের ভোটের নিরাপত্তার চিন্তা করে সে নিজের ক্ষমতা ও অবস্থানকে বাঁচাতে পারে না, বরং উত্তম ও সফল ওই রাজনীতিবিদ যে অপর গোত্র ও দলের ভোট কেটে নিজের দলে শামিল করার চিন্তা করে। অনুরূপভাবে যে শাসক কেবল নিজের দেশের সীমান্ত রক্ষার চিন্তা করে, ধীরে ধীরে সে নিজের রাজ্যও হারিয়ে বসে। এর বিপরীতে যে শাসক নিজ রাজ্যকে বর্ধিত করার চিন্তা করে এবং অতিরিক্ত এলাকা দখল করে নিজের রাষ্ট্রের আওতায় আনার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকে- যদি সে নিজ রাজ্যে ও রাজত্বে বৃদ্ধি করতে নাও পারে কমপক্ষে নিজ রাজ্য অবশ্যই তার চেষ্টায় নিরাপদ থাকবে।

আমাদের অবস্থা হয়েছে সেই জমিদারের মতো, যে জমিদারের ২০০০/৩০০০ একর জমি ছিল। এত বিশাল জমি খোঁজ-খবর ঠিকভাবে নিতে পারে না। একদিন তার পতিত জমির এক কোনায় একজন মাঝি খুপরি ঘর তুলছে। আরেক দিন আরেকজনকে দেখা যায় আরেক কোণায় ছাপড়া ঘর তুলছে। জমিদার তো উদাসীন। উল্টো জমিদারকে দেখলে তারা সালাম দিয়ে বলে, জমিদার সাব! আমরা আছি এক কোণায়, এই একটু খুপরি তুলে থাকি আরকি। জমি তো আপনারই। আপনি বললে উঠে চলে যাব। জমিদার মনে করে কে নেবে আমার জমি! আমি হলাম এই এলাকার জমিদার। কিন্তু জমিদার আরেক দিন দেখে, ওরা টিন দিয়ে বেড়া দিয়েছে। তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, জমিদার সাব, এই একটু বেড়া দিছি আরকি, তেমন কিছু করব না। এইভাবে আরেক দিন ইট এনে প্রাচীর খাড়া করেছে। আর পরে একদিন দখলদার সবাই মিলে এত দল ভারি করেছে যে জমিদারের পক্ষে আর তাদেরকে সেই জমি থেকে উঠানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে ৯০% মুসলমান, আমরা মনে করছি, কে আমাদেরকে ইসলামহারা করবে? এইভাবে আমরা উদাসীন হওয়ায় খ্রীষ্টানরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুসলমানদের দলেদলে ঈমানহারা করছে। আমরা যদি এখনও সাবধান না হই, তবে অচিরেই এই আগুন প্রান্তিক মুসলিম সমাজ নয়, আমার ঘরকেও পোড়াবে। সেই দিন বোধ হয় আর বেশি দূরে নয়। স্পেন, ইতালি, ফিলিপিন, পূর্বতীর এই সকল মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল, এখন খ্রীষ্টান রাজ্য।

---

[11] সত্যের দাওয়াত পৃনা – ২৩ (দাঈ মুশফিকুর রহমান)

সুতরাং মিশনারীদের নিরীহ ভঙ্গি দেখে উদাসীন থাকার কোনো সুযোগ তাদের তৎপরতায় যেন এদেশের মুসলিম সমাজ আক্রান্ত না হয়, সে জন্য প্রত্যেকেরই সচেতন হওয়া উচিত। একইসঙ্গে তাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারার গলদ সম্পর্কে অবগত হয়ে দাওয়াতী কাজে সক্রিয় হওয়া দরকার।

তাই এ মুহূর্ত থেকে আমরা যদি খ্রীষ্টানদের এ অপচেষ্টা রোধে বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সক্রিয় ও সোচ্চার না হই, তবে অচিরেই এর ফল আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের ভোগ করতে হবে। তারা ঈমানহারা হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তখন কিছুই করার থাকবে না! আল্লাহর শাস্তি তখন সবার উপর নেমে আসবে।

তাই প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব-কর্তব্য, নিজেকে একজন দাঈ মনে করে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর দ্বীনকে আগে বাড়িয়ে নেবে এবং এক আদমের বংশধর হিসাবে প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর সত্যধর্ম- ইসলামের উপর উঠিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। ধৈর্যের সাথে, হেকমতের সাথে একমাত্র রাজি-খুশি করার লক্ষ্যে দাওয়াতের কাজ করে যাওয়া মুসলমানের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমরা নিজেরা সরাসরি এই দাওয়াতের কাজ না করতে পারি হুদহুদ পাখির দায়িত্বটুকু পালন করি, হযরত সোলায়মান আ. যখন হুদহুদ পাখিকে খুঁজতে ছিলেন তখন সে এসে পয়গম্বরকে খোঁজ দিলেন যে, দূরে তার দেশে এক মহিলা সে আল্লাহর সাথে শরিক করছে, তাই বলছি আমরা দাওয়াত দিতে না পারি, যাকে দিতে হবে তার কাছে রাহাবারি করে দায়ীকে নিয়ে যাই।

রাসূল (সাঃ) তার বিদায় ভাষণে এটাই বলে গেছেন "আজ থেকে যে একটি আয়াত জান আমার পক্ষ থেকে তা আরেক ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দাও"। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে দামী উম্মত করেছেন কারণ এই উম্মতকেই এই নবীওয়ালা কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। কারণ নবী আর আসবে না, কিতাবও আসবে না, তা হলে এই বর্তমান উম্মতের কাছে কে পৌঁছাবে আল্লাহর কালেমার দাওয়াত? আমাদের ২০/৩০ জেনারেশন আগের পূর্ব পুরুষেরা হয়ত মুসলমান ছিল না, আরব দেশ থেকে ইসলাম প্রচারে তারা এ দেশে এসেছে এবং তাদের ধর্ম প্রচারে আজ আমরা ইসলাম পেয়েছি।

এখানে একটি কথা না বললেই নয়, মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দাওয়াতে অনীহার দরুন খ্রীষ্টান প্রচারকদের জন্য অন্যধর্মের লোকদের ধর্মান্তর করার বিষয়টি অত্যন্ত সহজ হয়েছে। তারা এ কোন্দল বিভেদের এ সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। আমরা মুসলমানরা ছোটখাট মতভেদ নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর ও শত্রুতায় লিপ্ত যে, আমাদের চোখের সামনে মুসলিম ভাইবোনরা মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। উপরন্তু সেসব বিষয়ে চিন্তাও করছি না।

ইসলাম কাদের ধর্ম ? [12]

প্রিয় পাঠক! আমাদের আজকের দরসটির নাম হলো ইসলাম কাদের? এই দরসটি প্রস্তুত করা হয়েছে মুসলমানদের জন্য। এই দরসে অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কুরআন সুন্নাহর এমন সব প্রমাণাদি, যার দ্বারা মুসলমানরা নিজ দায়িত্ব অনুভব করতে পারবে।

কোনো অমুসলিম ভাইকে যদি প্রশ্ন কারা হয়, বলুনতো, ইসলাম কাদের জন্য? এর উত্তরে তারা বলবে, ইসলাম মুসলমানদের ধর্ম। একই প্রশ্ন যদি কোনো মুসলমানকে করা হয়, তাহলে তার উত্তরে মুসলমানরা বলবে ইসলাম আমাদের ধর্ম। বন্ধুগণ! উত্তরটি কি সঠিক হয়েছে? না, সঠিক হয়নি। সঠিক উত্তর হলো, ইসলাম সকল মানুষের। ইসলাম হলো, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম। ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত। আল্লাহর নেয়ামত হিন্দু মুসলিম সবার জন্য সমান হয়। পৃথিবীর আটশ কোটি মানুষের মধ্যে, মাত্র দুইশ কোটি মানুষ মুসলিম। এটা কীভাবে সম্ভব আল্লাহ তা'আলা মাত্র ২০ ভাগ মুসলমানকে ইসলামের মতো নেয়ামত দেবেন, আর বাকিদেরকে দেবেন না? না, এটা হতে পারে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ধর্ম সকল মানুষের জন্য। কারণ আল্লাহর নেয়ামত সবার জন্য সমান হয়। যেমন পানি, চাঁদ, সূর্য, শষ্য, ধান, গম ইত্যাদি। আল্লাহর এসব নেয়ামতের মধ্যে কোনো ধরনের ভাগ হয় না। এমনটিও হয় না যে, এটা মুসলমানদের জন্য আর ওটা অমুসলিমদের জন্য। ঠিক ইসলাম যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাই ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য হতে পারে না। ইসলামকে মানা হিন্দু, খ্রিস্টানসহ সকল অমুসলিম ও মুসলিমদের জন্য সমান।

চলুন দেখি কুরআন এ ব্যাপারে কী বলে? কুরআনে হাকীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এরশাদ করেন-

---

[12] ইসলাম কাদের ধর্ম ? পৃ:না: – ৫ (দাঈ মুফতি যুবায়ের আহমদ)

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ ۟

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।[13]

কোনো অমুসলিম যদি পরকালের সফলতার জন্য, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে অনুসরণ করে, তাহলে সে কি সফল হবে? মুক্তি পাবে? না কখনও না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾

অর্থ: যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম কামনা করবে, তার থেকে তা কখনই কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।[14]

আল্লাহ তা'আলা তার নেয়ামতকে সকল মানুষের জন্য ব্যাপক করেছেন। বাতাস সকল মানুষের জন্য। পানি সকল মানুষের জন্য। চন্দ্র, সূর্য সবকিছু সকল মানুষের জন্য। আর ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য হবে, এটা হতে পারে না। সকল মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম।

এখন প্রশ্ন হলো, এই কথা কি অমুসলিমরা জানে যে, ইসলাম তাদেরও ধর্ম? জানে না। মুসলমানরা জানে। কারণ তারা কুরআন পড়ে। অমুসলিমরা তো আর কুরআন পড়ে না। আমরা মুসলমানরা কি অমুসলিমদেরকে বলেছি যে, ভাই! আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, কারণ ইসলাম আপনারই ধর্ম। আপনার মালিকের পক্ষ থেকে আসা ধর্ম যদি আপনি না মানেন, তাহলে আপনাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলতে হবে। আমরাকি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি?

বন্ধুগণ! অমুসলিমদেরকে কারা দাওয়াত দিবে? এখন কি কোনো নবী আসবে তাদেরকে দাওয়াত দিতে? না কোনো ফেরেশতা আসবে? কেউ আসবেন না, এই দায়িত্ব আমাদেরই, আমাদেরকেই দাওয়াত দিতে হবে। সকল মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব হলো আমাদের মুসলামানদের। আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে দাওয়াতের হক আদায় করার তৌফিক দান করেন। আমিন!!

আল্লাহ কাদের মালিক ?[15]

কোনো অমুসলিম ভাইকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বলুন তো আপনার স্রষ্টা বা মালিক কে? কেউ বলবে ইশ্বর, কেউ বলবে ভগবান, কেউ বলবে মালিকে। মুসলমানরা বলবে আমাদের মালিকের না হলো আল্লাহ। এই উত্তর কি সঠিক? আল্লাহ কি শুধু মুসলমানদের স্রষ্টা? না, তিনি হলেন সকল মানুষের স্রষ্টা ও মালিক। তারই ইবাদত করতে হবে। দেখুন এ ব্যাপরে আল্লাহ তাআলা কী বলেন।
কুরআনে হাকীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর ইবাদতের হুকুম দিতে গিয়ে এরশাদ করেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۲۱﴾

অর্থ: হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারি অর্জন করতে পারবে।[16]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা (يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ) শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হয় হে মানবগণ! এখানে ' النَّاسُ 'শব্দের ভিতর রাসূলে কারীম ﷺথেকে নিয়ে কেয়ামাত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে সকলেই এই মানুষের অন্তর্ভুক্ত। এখানে না আছে কোনো যুগের শর্ত,

---

[13] আলে-ইমরান:৩:১৯

[14] আলে-ইমরান: ০৩:৮৫

[15] ইসলাম কাদের ধর্ম ? পৃ:না: – ৫ (দাঈ মুফতি যুবায়ের আহমদ)

[16] বাকারাহ-২১

না আছে কোনো অঞ্চল নির্দিষ্ট? বরং সকল মানুষকে আল্লাহ তা’আলা নির্দেশ দিচ্ছেন (يَاَيُّهَا النَّاسُ) হে মানব সকল! পৃথিবীর ৬ শত কোটি মানুষ সকলেই মানুষের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো- ৬ শত কোটি মানুষ সকলেই কি আল্লাহর ইবাদত করে? অথবা কমপক্ষে এতটুকু কি তাদের জানা আছে যে, আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে? যদি উত্তর ‘না’ হয়। তাহলে কোনো মুসলমানের পক্ষ থেকে অমুসলিম ভাইদের কাছে এ কথা পৌঁছানো হয়েছে কি? তাহলে কোনো মুসলমানের পক্ষ থেকে অমুসলিম ভাইদের কাছে এ কথা পৌঁছানো হয়েছে? তবে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব কার? অবশ্যই মুসলমানদের । আমরা কি তাদের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছিয়েছি? কখনও কি অমুসলিম ভাইকে বলেছি? ভাই। আপনার মালিক হলেন আল্লাহ, তাকেই মানতে হবে । মুসলমানের উচিত, তারা সকল মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম ও দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেবে। আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

মুহাম্মাদ ﷺ কাদের নবী? [17]

কোনো অমুসলিমকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বলুন তো! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদের নবী? তারা বলবে মুহাম্মাদ ﷺ মুসলমানদের নবী। এমনিভাবে মুসলমানদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বলুন তো মুহাম্মাদ ﷺ কাদের নবী? তখন তারা বলবে তিনি তো আমাদেরই নবী। এই উত্তরগুলো কি সঠিক? রাসুলুল্লাহ ﷺ কি শুধু মুসলমানদেরই নবী ? চলুন আমরা কুরআনে হাকীমকে জিজ্ঞাসা করি, কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে?

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ
النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

অর্থ: বলে দাও, হে মানব মণ্ডলী । তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল, সমগ্র আসমান ও জমিনে তার রাজত্ব । একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয় । তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন । সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর ওপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর ওপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের ওপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার। [18]

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে 'মানুষ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ইয়াহুদী ইত্যাদি, সকলেরই নবী হলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ কারণ তারা সকলেই মানুষ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা কি জানে বা মনে করে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম তাদেরও নবী? না কখনও না। তারা জানে না। জানবে কিভাবে? তারা তো কুরআন পড়ে না। মুসলমানরা কুরআন পড়ে। কিন্তু আমরা কোনোদিন কোনো অমুসলিমদেরকে বলি নি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম তাদেরও নবী। এর জন্য অপরাধী হলাম আমরাই।

উপরোক্ত আয়াতে লক্ষ করলে আরো একটি বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। এখানে النَّاسُ শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হলো “সবাই এখানে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে, কোন শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি। অতএব, আমাদের জন্য উচিত, আমরা নিজেরা ভুল ধারণা পোষণ করবো না এবং অন্য মানুষের ভুলটি ভাঙিয়ে দিবো। চলুন আমরা সকল মানুষের কাছে এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দিই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের হক আদায় করার তৌফিক দান করুন।

কুরআন কাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ?[19]

কুরআন সম্পর্কে আমাদের মাঝে একটি বড় ভুল ধারণা রয়েছে। কোনো হিন্দু ভাইকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বলুনতো কুরআন কাদের গ্রন্থ? উত্তরে তারা বলবে এটা মুসলমানদের গ্রন্থ। আমাদের গ্রন্থ হলো গীতা, রামায়ন, ইত্যাদি। খ্রিস্টান ভাইয়েরা এমন প্রশ্নের উত্তরে বলবে আমাদের কিতাব হলো বাইবেল। আর কুরআন হলো মুসলমানদের কিতাব। ঠিক কোনো মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বলুন তো কুরআন কাদের জন্য? তাহলে মুসলমানরাও বলবে, কুরআন আমাদের জন্য । চলুন কুরআনকে জিজ্ঞাসা করি, কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে
আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[17] ইসলাম কাদের ধর্ম ? পৃ:না: – ৮ (দাঈ মুফতি যুবায়ের আহমদ)

[18] আ’রাফ: আয়াত: ১৫৮

[19] ইসলাম কাদের ধর্ম ? পৃ:না: – ৯ (দাঈ মুফতি যুবায়ের আহমদ)

شَہۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡہِ الۡقُرۡاٰنُ ہُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡہُدٰی وَ الۡفُرۡقَانِ

অর্থ : বরকতময় রমজান মাসে সকল মানুষের হেদায়াতের জন্য কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।[20]

উক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, هدى للناس (সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েত) বলা হয়েছে। তাতে শুধু মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়নি, তা কেবল তোমাদের জন্য পথ প্রদর্শক। অতএব, আমরা যদি মনে করি যে, আল-কুরআন শুধু মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ, তাহলে তা হবে নিছক ভুল ধারণা। আবার একই প্রশ্ন উঠবে ৬শ কোটি অমুসলিম তারা কি জানে এই কিতাব তাদের জন্য পথ পদর্শক? এর উত্তরে আপনি নিজেই বলবেন অবশ্যই তারা জানে না।

কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য হলো, সকল মানুষের হেদায়াত। শুধু মুসলমানের হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে তার ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শুধু ২০ ভাগ মানুষ মুসলমান এবাদাত করবে? এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু মাত্র ২০ ভাগ মানুষ তার ওপর ঈমান আনে। ঠিক কুরআন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু এর অনুসারী মাত্র ২০ ভাগ। বাকি ৮০ ভাগ অমুসলিম তাদের এটাও তো জানা নেই যে, আল্লাহ তাদের প্রতিপালক। তাদেরকে আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে। এও জানে না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরও নবী। কুরআন তাদের হেদায়েতের জন্য এসেছে এটাও তাদের জানা নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'আলা কি ৮০ ভাগ অমুসলিমদের জন্য আরো কোনো ধর্ম পাঠাবেন? তাদের জন্য কি আরো কোনো রাসুল আসবেন? না, কখনও না। কারণ আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শেষ রাসুল তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। ওহীর ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর নতুন কোনো কিতাব তো আসার প্রশ্নই আসে না। এখন দেখতে হবে ৮০ ভাগ অমুসলিমদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব কাদের? আল্লাহ তা'আলা কি মুসলমানাদেরকে শুধু মুসলমানাদের এসলাহের জন্য পাঠিয়েছেন? না কি অমুসলিমদের পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছিয়ো দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন? দেখুন এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কী বলেন।

মুসলমান কাদের জন্য ? [21]

সাধারণ মুসলমানদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আমারা কাদের জন্য তাহলে অনেকেই বলেন, আমরা আল্লাহর জন্য। এই উত্তরটিও সঠিক তার অবস্থান থেকে। সামষ্টিকভাবে আমরা হলাম সকল মানুষের জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল মানুষের জন্য বের করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُنۡتُمۡ خَیۡرَ اُمَّۃٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ تَنۡہَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ

তোমরা সর্বত্তম জাতি, তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর। [22]

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা –(اَلنَّاسُ) "মানুষ" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হলো, অমুসলিমরাও মানুষ। মুসলিম জাতিকে শুধু মুসলমানদের জন্য পাঠাননি বরং সকল অমুসলিমদের জন্যও পাঠিয়েছেন।

বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) خَیۡرَ اُمَّۃٍ 'উত্তম জাতি' বলে সম্বোধন করেছেন। (২) لِلنَّاسِ'মানুষ'। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর ৬শত কোটি অমুসলিম "মানুষ" এর জন্য ২শত কোটি মুসলমান خَیۡرَ اُمَّۃٍ উত্তম জাতি' ৬শত কোটি অমুসলিম মানুষকে এ, لْمَعْرُوۡفِসৎকাজের আদেশ করবে এবং الۡمُنۡکَرِ অসৎ কাজের বাঁধা প্রদান করবে।

এই আয়াতে একটি সুক্ষ্ম বিষয় বুঝা যায়। তা হল উম্মতের দায়িত্বকে ঈমানের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। জিম্মাদারি দুই প্রকার।

---

[20] বাকারাহ-১৮৫

[21] ইসলাম কাদের ধর্ম? পৃ:না: – ১১ (দাঈ মুফতি যুবায়ের আহমদ)

[22] আল ইমরান-১১০

(১) ব্যক্তিগত জিম্মাদারি। (২) সমষ্টিগত জিম্মাদারি।

ব্যক্তিগত দায়িত্বে আল্লাহ তা'আলা নিজের হক প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَ الۡاِنۡسَ اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡنِ ﴿۵۶﴾

আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। [23]

কিন্তু যেখানে সমষ্টিগত দায়িত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে বান্দার হককে প্রধান্য দিয়েছেন। উপরোক্ত আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। উম্মত যেন জাতীয় দায়িত্বের কথা চিন্তা করতে গিয়ে এ ধোঁকায় না পড়ে যে, এটাতো আমার কাজ নয়। আমার দায়িত্ব নয়। এর দ্বারা জাতিয় দায়িত্বের অনুভব হয়।

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে মুফাসিরগন লিখেছেন- خير امة উত্তম জাতি হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত।

(১) اَمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡف সৎ কাজের আদেশ। (২),, نهي عَنِ الۡمُنۡکَرِ অসৎকাজের নিষেধ। (৩) إيمان بالله আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

একটু ভাবুন, আমরা কি এই তিনটি শর্তের ওপর আমল করছি? যদি উত্তর নেতিবাচক হয়, তাহলে আমরা কি উত্তম জাতি? যদি উত্তর 'না' হয়, তাহলে এই জাতিকে উত্তম জাতি বানানোর ফিকির করতে হবে কি-না? এই জন্য আমাদেরকে اَمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡف এবং

نهي عَنِ الۡمُنۡکَر অর্থাৎ ধর্মের দাওয়াত ও তাবলিগ করতে হবে। যদি আমরা এই জিম্মাদারি আদায় না করি, তাহলে আমাদের ওপর আসতে পারে আল্লাহর কঠিন শাস্তি।

মোটকথা, মুসলমানদের কাজ হলো, সকল মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেবে। তাদের সামনে কুরআন ও নবীজীর পরিচয় তুলে ধরবে। আর ইসলামের পরিচয় করিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন উম্মতকে তার জিম্মাদারির হক আদায় করার তৌফিক দান করেন। আমিন! অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব শুধু শরয়ী না, মানবিক দায়িত্বও বটে।

জালিম কে? [24]

আসুন, আমরা একটু ভাবি, অমুসলিম সম্প্রদায় আমাদের সাথে যে শত্রুতা পোষোণ ও অত্যাচার করে, তা তিন প্রকার। অমুসলিমদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর অবমাননাকর বা উগ্র কথা বার্তা। যা আমাদের কানে আসে বা চোখে পড়ার কারণে অন্তর ব্যথিত হয়। তাদের আচরণে আমরা কষ্ট পাই বা আমাদের মন ভাঙে। এর বিনিময়ে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করি। হাদিস শরিফে আছে প্রতিটি বস্তুর মূল্য তত বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, শারীরিক কষ্ট। বিভিন্ন ধরণের দাঙ্গা হাঙ্গামা আমাদেরকে শারীরিকভাবে কষ্ট দেয়। এর ফল কি দাঁড়ায়? হাদিসের এসেছে মুমিনের গায়ে কাঁটা বিধলে এর প্রতিদানে তার একটি গুনাহ মাফ হয়, একটি নেকী যোগ হয়। মর্যাদার সিঁড়ি এক ধাপ বৃদ্ধি পায়। একটি কাঁটা যখন এতো লাভ তখন এতসব কষ্টের বিনিময়ের তো হিসাব করে শেষ করা যাবে না। আর যখন এসব কষ্ট কেবল মুসলমান হওয়ার কারণে, আমাদেরকে দেওয়া হয়। এর বিনিময় কী হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের শত্রুতা হচ্ছে, মুসলিম হওয়ার কারনে আমাদেরকে হত্যা করে। শহীদ করে দেয়। চিন্তা করুন শাহাদাত কত বড় সম্মানের বিষয়। আল্লাহ তাআল বলেন,

وَ لَا تَقُوۡلُوۡا لِمَنۡ یُّقۡتَلُ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ اَمۡوَاتٌ ؕ بَلۡ اَحۡیَآءٌ وَّ لٰکِنۡ لَّا تَشۡعُرُوۡنَ ﴿۱۵۴﴾

---

[23] সূরা যারিয়াত-৫৬

[24] ইসলাম কাদের ধর্ম ? পৃ:না: –১৪ (দাঈ মুফতি যুবায়ের আহমদ)

আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলিও না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না। [25]

রাসূল ﷺ এর সব চেয়ে প্রিয় সুন্নাত [26]

রাসূলুল্লাহ -এর সবচেয়ে বড় সুন্নাত ছিল দাওয়াত। বিশেষত অমুসলিম ভাই-বোনদের মাঝে দাওয়াত। তিনি ১০০ ভাগ অমুসলিমের মাঝে দাওয়াতি কাজ শুরু করেছেন। অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং যারা মুসলমান হয়েছেন, তাদের ইসলাহ ও সংশোধন করেছেন। ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলাল্লাহ, আপনার অবর্তমানে আমাদের কাজ কী? নবী কারীম বললেন, আমার যা কাজ ছিল তোমাদেরও একই কাজ। উত্তর শুনে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন দেশে দাওয়াত দিতে ছড়িয়ে পড়লেন। এখন প্রশ্ন হলো তারা বিভিন্ন দেশে সফর করে কাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন? অবশ্যই অমুসলিমদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছেন এবং লোকেরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। মোটকথা, নবীজীর সবচেয়ে বড় আশা ছিল প্রতিটি মানুষ যেন ইসলাম গ্রহণ করে। তাইতো আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সান্তনা দিচ্ছেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (٣)

তারা ঈমান আনছে না এই দুঃখে হয়ত তুমি নিজের জীবন শেষ কওে দেবে। [27]

আল্লাহ আমাদের অন্তরে উম্মতের দরদ সৃষ্টি করে দিন। উম্মতের ফিকির করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী? [28]

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, অমুসলিম ভাই-বোনদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ফরজে কেফায়া। অনেকে বলেছেন সাধ্যানুযায়ী ফরজে আইন। আমরা ফরজে কেফায়াই ধরে নিলাম। এবার আমাদের জানতে হবে ফরজে কেফায়া কাকে বলে?

ফরজে কেফায়া [29]

ফরজে কেফায়া বলা হয় এমন হুকুম বা কাজ, যা সকল মুসলমানের উপর ফরজ। তবে সকলের পক্ষ থেকে যদি কিছু মানুষ ওই কাজ আদায় করে দেয়, তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না।

সাধারণত ফরজে কেফায়া বলতে আমরা জানাজার নামাযকে বুঝি। উদহারণ স্বরূপ, যদি জানাযার নামাযকেই ধরা যায়, তাহলে (কাফন দাফন সহ) জানাজার নামায সম্পূর্ণ করতে হলে কমপক্ষে চারজন লোকের প্রয়োজন। জামাতের জন্য একজন ইমাম হলে, বাকি তিনজন মুক্তাদি। দাফনের জন্য দু'জন, কবরের উপরে দু'জন, আর কবরে নেমে দু'জন মুরদাকে রাখবে। মোট কথা, কাফন-দাফন সম্পন্ন হতে হলে মোট চারজন লোকের প্রয়োজন। তাহলে ফরজে কেফায়া আদায় হবে। যদি ফরযে কেফায়া আদায় না হয়, তাহলে ওই মহল্লার সকলেই গুনাহগার হবে এবং সমাপ্ত করার দায়িত্ব পড়বে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের উপর। যদি তারাও আদায় না করে, তাহলে পর্যায়ক্রমে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে। তদ্রূপ অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হলো ফরজে কেফায়া। প্রত্যেক অমুসলিমের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এমন কিছু লোক থাকতে হবে। যাদের মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে যায়। যদি সকলের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে, তাহলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে। জানাজার নামাযের সাথে মিলালে বোঝা যায়, প্রত্যেক এলাকায় কমপক্ষে চার জন ব্যক্তি এমন থাকতে হবে, যারা সর্বদায় অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদিও চারজন দ্বারা দাওয়াতের ফরজে কেফায়া আদায় হবে না।

প্রিয় পাঠক! এবার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি বলুন তো দেখি! আপনার এলাকায় (আপনি যে অঞ্চলেরই হোন না কেন।) এমন চারজন ব্যক্তি আছে, যারা সর্বদা অমুসলিমদের দাওয়াত দিচ্ছে? যদি এলাকায় না থাকে তাহলে আপনার পুরো জেলায় এমন চারজন মানুষ

---

[25] বাকারাহ-১৫৪

[26] হিন্দুভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি পৃ:না-২৯ (দায়ী মুফতি যুবায়ের আহমদ হাফি.)

[27] আশ শু'আরা-৩

[28] হিন্দুভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি পৃ:না-২৫

[29] হিন্দুভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি পৃ:না-২৫

আছে কি? যারা সর্বদা সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে? যদি উত্তর হয় 'না'। তাহলে আমরা কি ফরজে কেফায়া আদায় করছি? যদি আদায় না করে থাকি তাহলে আমরা কি গুনাহগার হচ্ছি না? অবশ্যই হচ্ছি। আর কতদিন এই ফরজে কেফায়া ছেড়ে দেয়ার গুনাহ মাথায় নিয়ে ঘুরবো? যদি কোনো ব্যক্তি এককভাবে দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি নিজে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সকলেই গুনাহগার হবে।
প্রিয় পাঠক! এখনো সময় আছে, আসুন, অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিজে গুনাহ থেকে বাঁচি, অন্যকে বাঁচাই। আর পরস্পরে একে অপরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করি।

বর্তমান বিধর্মীদের কাছে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে ভুল ধারনা [30]

আমরা মুসলমানদের মধ্যে একটা অ-মূলক ধারণা যে, অমুসলিমরা নাজাসাতযুক্ত, কীভাবে তারা মসজিদে ঢুকবে, কুরআন ধরবে, কুরআন পড়বে, কীভাবে অপবিত্র মুখে আল্লাহ রাসূলের নাম নেবে। অমুসলিমরা ভাবে, মুসলমানরা তো আমাদের অপছন্দ করে, অস্ত্রের ছায়ায় বসবাসকারী জাতি। কীভাবে তাদের ধর্মকে বেছে নেই। আবার আমাদের অনেকে ভাবে, বাংলাদেশের যে অবস্থা, দাওয়াতের এই কাজ করার প্রশ্নই আসে না। মুসলমানদের বিরাট অংশই দ্বীনের উপরে নেই-এ অবস্থায় বিধর্মীদের কাছে দাওয়াত, এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। পুলিশের, সরকারের কুদৃষ্টিতে পড়া চলবে না। মুসলমানরা এখন এ জাতীয় কাজ নিয়ে দাঁড়াতেই পারবে না। এই কাজে নামলেই গ্রেফতার হতে হবে। দাওয়াতের ব্যাপারে কেউ কেউ এমনও ভাবেন যে, যদি অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত দেওয়া এতই জরুরি হত, তবে তো এ কাজে সবার আগে আমাদের আকাবিররাই তৎপর থাকত, তারা কেন এ কাজ থেকে সরে আছেন? এই রকম হাজার প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে।

এর উত্তর হচ্ছে, আসলে আমাদের জানার ভুল রয়েছে। আমাদের আকাবিরের ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, অধিকাংশ আকাবির দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। পীর-আওলিয়া, সুফি-সাধক, বুজুর্গদের জীবনী পড়লে দেখা যায়, তাঁদের মাধ্যমেই এই বাংলায় ইসলামের গোড়াপত্তন হয়েছে, বিভিন্ন থেকেই এ কাজ পরিচালিত হয়েছে। অপর দিকে আমরা রাসূলের দিকে, তাঁর সময়ের দিকে ফিরে তাকালে দেখব, তিনি কী পরিস্থিতিতে দাওয়াতের কাজ করেছেন। তখন কি সমস্ত লোক তাঁর পক্ষে কাজ করেছে? না, কেউই তাঁর পক্ষে কাজ করেনি, তখন মক্কা নগরী যারা পরিচালিত করেছেন তারা সকলেই ছিল কাফের, আবু যেহেল, ওতবা সাইবা, আবু সুফিয়ান, এবং কি মক্কার অন্যান্ন লোকেরাও, কিন্তু যখন তিনি দাওয়াতে নেমেছেন তখন মানুষ দীন কবুল করেছে। তিনি একাই ছিলেন হকের পক্ষে। সবাই ছিল তাঁর বিরোধী। তিনি কি তখন বসে ছিলেন? দীন প্রচার করেননি? আজ আপনার আপন ভাই যদি কঠিন অসুখে পরত, কোন বিপদের সম্মুক্ষিন হত, আগুনে বা পানিতে পরতে যেত, আপনি তাকে অবশ্যই সাবধান করতেন, অন্যে কি বলবে সে দিকে তাকাতেন না। আর পুলিশের কথা বলছেন, ভাই ধর্ম প্রচার করা আপনার সাংবিধানিক অধিকার, এই কাজ বে আইনি নয়। বর্তমান সংবিধানে ৪১/১/ক ধারায় বলা আছে যে যে তার নিজ ধর্মকে প্রচার করতে পারবে, তবে আপনার ভয় কোথায়? তাই বলছি, এই বাস্তব অবস্থা স্বীকার করেই দাওয়াতের কাজ করতে হবে। সব যুগেই এই নীতি ও হিম্মত বজায় রাখতে হবে।

আমাদের মুসলমানদের মধ্যে একদল ভাইয়ের মধ্যে ভুল ধারনা আছে, তারা বলেন, আমরা আগে ঠিক হই তাহলে বিধর্মীরা আমাদেরকে দেখে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এটা আমাদের ভুল ধারনা। কেননা বাস্তবে আমরা দেখতেছি দিন দিন মানুষের অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে, অপর দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস এবং যা আমরা প্রতি খুতবাতে খতিব সাহেবগণের মুখ থেকে শুনে থাকি, সবচাইতে উত্তম যুগ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ, এরপর সাহাবাদের যুগ, এর পরের যুগ, এই ভাবে ধীরে ধীরে মানুষের অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে। সুতরাং আমরা যদি ভাবি আগে আমরা ঠিক হব, তাহলে অন্যরা আমাদের দেখে এমনেই ঠিক হয়ে যাবে, তবে কিয়ামত এসে যাবে আমাদেরও ঠিক হওয়া হবে না, আর বিধর্মীদেরও দায়াত দেওয়া হবে না।

পরিশেষে বলব, দীনের এ কাজ প্রচার করা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। অবহেলা না করি, এ কাজ মহৎ ও পবিত্র। আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় কাজ। উম্মতে মোহাম্মদীর মূল উদ্দেশ্য দাওয়াত। তাই দাওয়াতকে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। দীনের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এরূপ একটা দল থাকবে যারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষকে আহ্বান করবে। তাই স্বেচ্ছায় আমরা একেকজন দাঈ বনে যাই, দাওয়াতকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেই । দিনরাত রেসালতের বাণী পৌঁছাতে নিয়োজিত হয়ে পড়ি এবং ইখলাসের সাথে আমল করি।

দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব কাদের? [31]

---

[30] সত্যের দাওয়াত পৃ:না – ৩১ (দাঈ মুশফিকুর রহমান হাফি.)

[31] হিন্দুভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি পৃ:না-২৬

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের। আমরা অনেকে মনে করি এই দায়িত্ব শুধু ওলামায়ে কেরামের। না ভাই! বরং এই দায়িত্ব সকলের উপর অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরা উত্তম জাতি তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের জন্য"। [32]

কিন্তু এখানে বলেননি যে, হে ওলামায়ে কেরাম! তোমরা উত্তম জাতি। বরং এখানে সকল মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। রাসুল ইরশাদ করেন-"আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।" এখানে বলা হয়নি, হে ওলামায়ে কেরাম তোমরা পৌঁছে দাও। উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় এই দায়িত্ব সকল মুসলমানের উপর অর্পিত হয়েছে। অতএব, বুঝা গেল আপনি ইঞ্জিনিয়ার হোন, আর ডাক্তার হোন, কৃষক হোন আর দিন-মজুর হোন, যেই হোন না কেন, আপনাকে নিজের আত্মশুদ্ধির চিন্তা করতে হবে এবং অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়া মানবতার দাবি [33]

মানব থেকে মানবতা, প্রতিটি মানুষের মানবতার দাবি হলো, সে অন্য মানুষের উপকার করবে। আর কেউ যদি কোনো বিপদে পড়ে তাহলে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। আমরা মুসলমানগণ জানি, প্রতিটি অমুসলিম মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَہْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَہَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْہَا ؕ اُولٰٓئِكَ ہُمْ شَرُّ الْبَرِيَّۃِ ؕ

অর্থ: আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ী ভাবে থাকবে। তারা সৃষ্টির অধম। [34]

প্রিয় পাঠক! আপনার প্রতিবেশী হিন্দু বা খ্রিস্টানদের বাড়িতে যদি আগুন লেগে যায়, তাহলে আপনি কি বসে থাকবেন? না আগুন নিভাতে যাবেন? অবশ্যই আগুন নিভাতে যাবেন। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো মুসলিম মহল্লায় আগুন লেগে যায়, তাহলে প্রতিবেশী অমুসলিম ভাইয়েরা কি বসে থাকবেন? না আগুন নিভাতে যাবে না? অবশ্যই আগুন নিভাতে আসবে। দেখুন! আমরা দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী আগুন থেকে উদ্ধার করার জন্য কত সুন্দর মানবতার পরিচয় দিয়ে থাকি। কিন্তু একটু কি চিন্তা করেছি যে, দুনিয়ার আগুনে জ্বলে যদি কারো ত্বক নষ্ট হয়ে যায়, বা ঘর বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, তাহলে ঔষধ দ্বারা পুনরায় ত্বক ফিরিয়ে আনা সম্ভব। পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে উত্তম বাড়ি বানানো সম্ভব। কিন্তু যে ভাইটি ইসলাম গ্রহণ না করে, চিরস্থায়ী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, যার থেকে ফিরানো বা বাঁচানোর কোনো পথ নেই, সেই চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য কি কখনো ভেবেছি?

প্রিয় পাঠক! আমাদের অনেক অমুসলিম বন্ধু আছেন, যাদের সাথে একত্রে চলা-ফেরা করি। একই অফিসে চাকরি করি। তার দোকান থেকে কেনা-কাটা করি। তার বিপদে-আপদে সহযোগিতার হাত বাড়াই। একথাও জানি এই ভাইটি মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী আগুনে জ্বলবে।
প্রিয় পাঠক! আমাদের কেমন মানবতা? আমার সামনে আমার এক ভাই বা বোন জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, কিন্তু কোনো দিন এই ভাইটিকে বলিনি যে, ভাই! তুমি যে রাস্তায় চলছো এটা জাহান্নামের পথ। কোনো দিন তাকে জান্নাতের পথ ইসলাম দেখাইনি। কেমন জানি তাকে আগুনে জ্বলতে দেখেও আমি চুপ হয়ে আছি। এটা আমাদের কেমন মানবতা? আর কতো দিন এভাবে দেখব? বলুন! এভাবে আর কতোদিন বসে বসে তাদেরকে আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখব? চলুন, আর সময় নেই, আমার কাছে যদি সত্যিকার মানবতা থাকে, তাহলে আমার প্রতিবেশী অমুসলিমকে আগুনে জ্বলতে দিব না। আমাদের দায়িত্ব হলো তাকে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেয়া। মানা না মানা তার ব্যাপার। দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার, গ্রহণ করা না করা তাদের এখতিয়ার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের আমানত 'ইসলাম' তাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে ওদেরকে চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচানোর মাধ্যম বানিয়ে নিন এবং আমাদের উপর তিনি খুশি হয়ে যান। আমীন।

32 আলে ইমরান: ১১০

33 হিন্দুভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি পৃ:না-২৭

34 সূরা বাইয়্যিনাহ:৬

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সমস্যার সমাধান [35]

এ জন্যে এ উম্মতের পরাজয়, ভীতি ও অপদস্থতার আধ্যাত্মিক চিকিৎসাও কেবল এটাই যে, এ উম্মত নিজের অবস্থান জানবে এবং দাওয়াতকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবে। আর সমগ্র মানবতার এ পথভ্রষ্টতাকে কেটে দিয়ে তাকে কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে আনাকে নিজের উদ্দেশ্য জানবে, আর নিজেদেরকে দায়ী উম্মত হিসেবে প্রমাণ করবে। এ উম্মতের চিকিৎসা হলো ইসলামের দাওয়াত। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তব্য যে, যে নেতা কেবল নিজের ভোটের নিরাপত্তার চিন্তা করে, সে নিজের ক্ষমতা ও অবস্থানকে বাঁচাতে পারে না বরং উত্তম ও সফল ওই রাজনীতিবিদ যিনি অপর গোত্র ও দলের ভোট কেটে নিজের দলে শামিল করার চিন্তা করেন। অনুরূপভাবে যে শাসক কেবল নিজের দেশের সীমান্ত রক্ষার চিন্তা করে, ধীরে ধীরে সে নিজের রাজ্যও হারিয়ে বসে। এর বিপরীতে যে শাসক নিজ রাজ্যকে বর্ধিত করার চিন্তা করে এবং অতিরিক্ত এলাকা দখল করার উদ্দেশে সচেষ্ট থাকে যদি সে নিজ রাজ্য ও রাজত্ব বৃদ্ধি করতে নাও পারে কমপক্ষে নিজ রাজ্য অবশ্যই নিরাপদ থাকবে।

এই বিবেচনায়ও মুসলিম উম্মতের স্থায়িত্ব ও নেতৃত্বের জন্য এটা আবশ্যক যে, নিজ মুসলমান ভাইয়ের উপর মেহনত করে তাদের ঈমান ও ইসলামের ওপর দৃঢ় অবস্থানে স্থির রাখার চিন্তাই কেবল নয়, অপরাপর সম্প্রদায়কেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যকে ধর্মহীনতা থেকে বাঁচানোর ফিকির ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব কোনোক্রমেই কম নয়। কিন্তু কেবল এটাকেই উদ্দেশ্য ধরে নেয়া কখনই যথেষ্ট হতে পারে না, বরং মুসলিম উম্মাহ্ ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য এবং ধর্মীয় জাগরণের জন্য অন্যদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করাও অত্যন্ত জরুরি।

এ পর্যন্ত বর্ণিত বিস্তৃত বিবরণে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, সর্বপ্রকারের চিন্তা অনুসারে মুসলিম উম্মাহর সকল সমস্যার সমাধান কেবল এবং একমাত্র ইসলামের দাওয়াত। কিন্তু পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য দাওয়াত দেয়া না উপকারী, না ফলপ্রসূ, আর না প্রশংসিত ও গ্রহণযোগ্য। আমাদের তো নিজেদের সম্পর্ক মহান রব-এর সাথে দৃঢ় করার ও দয়ালু অভিভাবক রাসুল ﷺ এর অনুগ্রহকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার এবং নিজের আত্মার সম্পর্ক তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যেই দাওয়াতের কাজকে হৃদয়ে ধারণ করা উচিত।

একজন হেদায়েত প্রাপ্ত হলেও তা তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট [36]

এক বর্ণনায় এসেছে যে, যখন কোনো দা'য়ী, কোনো ভ্রান্ত পথের পথিককে যে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনায় লিপ্ত থাকে এমন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত উপাসনা থেকে উদ্ধার করে, আল্লাহ্র পথে নিয়ে আসে এবং কোনো মানুষের হেদায়েত প্রাপ্তির মাধ্যম হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা দা'য়ী বান্দার প্রতি এমনই খুশি হন, যেমনটি খুশি হন সেই মুসাফির যে তার উটের পিঠে মাল-সামান নিয়ে বিরান মরুভূমিতে সফর করছিল, পথিমধ্যে সে একটি বৃক্ষের সাথে উটটি বেঁধে আরাম করছিল। জেগে দেখে উট উধাও। সে উটের খোঁজে বের হলো, কিন্তু কোথাও উটটি না পেয়ে নিরাশ হয়ে গেল। আর এ বিরান প্রান্তরে নিজের এহেন অবস্থার দরুন বুঝল যে, আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ উটটি মালামালসহ পাওয়া গেলে সে এতই আনন্দিত হয় যে, খুশির জোয়ারে ভেসে লোকটি কী বলতে কী বলে সে খেয়ালটাও তার ছিল না। খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে ফেলে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আর আমি তোমার খোদা-(?) অর্থাৎ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। বস্তুত এটা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে উদাহরণ দেয়া হয়েছে, যাতে অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া বোঝা যায়; অন্যথায় আল্লাহ তাআলার খুশি এ উদাহরণের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত হতে পারে?

প্রিয় পাঠক! প্রকৃত জিনিস যার জন্য সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) আগমন করেছেন, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মানুষের বরং দুনিয়ার সকল জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যেটাকে উদ্দেশ্য হিসেবে মনে করে ও কামনা করে, তা হলো নাজাত বা পরিত্রাণ। এখানে এক ব্যক্তির হেদায়েত প্রাপ্তিতে নাজাতের ওয়াদা করা হয়েছে। তাহলে কোন্ জিনিস আমাদেরকে এমন পবিত্র দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখছে? ওই মেহেরবান আল্লাহর সাথে যদি আমাদের ভালবাসার সম্পর্কের বাঁধন জোরদার করতে হয় তাহলে এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই যে, প্রিয়নবী ﷺএর অনুসরণ,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

"তারা ঈমান আনছে না এই দুঃখে হয়ত তুমি নিজের জীবন শেষ করে দিবে" [37]

---

[35] হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি পৃ:না-৩০

[36] হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি পৃ:না-৩০

[37] আশ শু'আরা-৩

দাওয়াত কে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য পরিণত করুন। আর যে সব একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের এর প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব হয় তাকে সৌভাগ্য মনে করুন। আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, স্বয়ং দায়ীর মধ্যেও কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যার কিছু নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

দাওয়াতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও দায়ীর গুণাবলী [38]

স্থান কাল পাত্র বিশেষ মাদউর (আহ্বানকৃতের) অবস্থানের দিকে খেয়াল করে কিছু মূলনীতি এখানে পেশ করা হলো যার উপর আমল করা একজন দা'য়ীর উপর খুবই জরুরি।

১। নিয়তকে শুদ্ধ করবে। অর্থাৎ শুধু মাত্র আল্লাহর সমুষ্টির লক্ষ্যে দাওয়াত দিবে।
২। নিজের দাওয়াতের ওপর ১০০ ভাগ আস্থা ও বিশ্বাস রাখবে।
৩। বিশেষ করে হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের বিভিন্ন গ্র''পের ও আকিদা বিশ্বাসের ওপর ধারণা রাখতে হবে।
৪। খুব হিতাকাঙ্ক্ষিতা ও মুহাব্বতের সাথে স্থান-কাল পাত্র ভেদে প্রয়োজনীয় কথা বলবে।
৫। হিন্দুভাইদের পরিভাষায় তাদের সাথে কথা বলা। যেমন স্বর্গ (জান্নাত) নরক (জাহান্নাম) ইত্যাদি।
৬। জাতীয়তা অর্থাৎ আমরা একই পিতা-মাতার সন্তান। আদম হাওয়া সকলের পিতা-মাতা। আর পিতার সন্তান ভাই হয়ে থাকে, এভাবে ভাইয়ের সম্পর্ক বের করে কথা শুরু করা। প্রথমে তাওহীদের ব্যাপারে কথা বলা। এর পর কথার মোড় ঘুরিয়ে আখেরাতের কথা শুরু করা এবং আখেরাতের লাভ ক্ষতি বোঝানো। তারপর রেসালাতের কথা শুরু করা।
৭। দাওয়াতের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। যেমন নামায পড়ে দুআ করা।
৮। প্রমাণবিহীন কথা পরিহার করা, শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা।
৯। মাদউর (আহ্বানকৃত ব্যক্তির) বুদ্ধির পরিধি ও তার চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।
১০। দায়ী শুধু আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবে।
১১। তাড়াহুড়া পরিহার করবে।
১২। দা'য়ীর আমল হবে পরিপূর্ণ সুন্নত মুতাবিক, দা'য়ী যেই জিনিসের দিকে দাওয়াত দিবে তার ওপর নিজের আমল থাকতে হবে, যাতে সে অন্যের জন্য আদর্শ হতে পারে।
১৩। দা'য়ী উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে এবং দাওয়াতের কৌশল অবলম্বন করবে। কেননা এটা তার দাওয়াত কবুল হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
১৪। দা'য়ীর মাঝে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। দা'য়ীর জন্য জরুরি যে, সে দৃঢ় বিশ্বাসী হবে। নিজের দাওয়াতের আছর (প্রতিক্রিয়া) এবং নিজের সম্প্রদায়ের হেদায়াত থেকে নিরাশ হবে না, মন ভাংবে না, যদিও দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়। তাই আম্বিয়াদের জীবনী উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা, যেমন নূহ আ. এর ঘটনা।
১৫। দা'য়ী ইলম অনুযায়ী আমল করবে, একজন দা'য়ীর জন্য জরুরী সে যা শিখবে তার ওপর আমল করবে।
১৬। সর্বসম্মত বিষয় দ্বারা আলোচনা শুরু করবে।
১৭। ক্রোধবর্জন করবে, ধৈর্য ধারণ করবে।
১৯। নরম ভাষায় কথা বলবে। অশ্লীলতা ও রুক্ষতা পরিহার করবে ।
২০। উপস্থিত প্রমাণ না থাকলে তাহকীক (বিশেসন) ও গবেষণার জন্য সময় নেবে।
২১। যুক্তিহীন বিতর্ক থেকে বেঁচে থাকবে।
২২। প্রতিপক্ষের কথা মনোযোগসহ শুনবে, তার প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর দিবে।
২৩। মাদউর (আহ্বানকৃতের) বড়দের (দেবদেবীদের) ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করবে না।
২৪। নিজের বিপরীত অবস্থান সঠিক হলে সেই সত্য স্বীকার করে নিবে।
২৫ । তাদের জন্য বদদুআ করবে না।
২৬। গর্ব অহংকার পরিত্যাগ করে নম্রতা গ্রহণ করবে।
২৭। দা'য়ীর সমস্ত ইবাদত হবে শুধু আল্লাহর জন্য। ২৮। দা'য়ীর মধ্যে পরিপূর্ণ ইখলাছ থাকতে হবে।
২৯। দাওয়াতের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে ও মাদউকে তুচ্ছ মনে করবে না।
৩০। দা'য়ী মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে ও মেহমান প্রিয় হবে।
৩১। স্মরণ রাখবে যে, হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ।
৩২। দাওয়াতের পদ্ধতি সীরাত পাঠের মাধ্যমে নবুওয়াতের নূর হতে গ্রহণ করতে হবে।

[38] হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি পৃ:না-৩২

৩৩। দায়ীর মধ্যে স্নেহ ও মমতা থাকতে হবে।
৩৪ দা'য়ীকে খুবই বিনয়ী হতে হবে।
৩৫। দায়ীকে ক্ষমাশীল হতে হবে।
৩৬। দা'য়ীকে সহনশীল ও ধৈর্যশীল হতে হবে।
৩৭। দা'য়ীকে দুনিয়া বিমুখ হতে হবে।
৩৮। দায়ীকে মু'আমালার মধ্যে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। তথা হালাল রুজি অর্জন করতে হবে।
৩৯। দা'য়ীকে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে।
৪০। দায়ীকে অন্যের দোষ ত্রুটি গোপন করতে হবে।
৪১। দা'য়ী অন্যকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করবে, নিজেকে ছোট মনে করবে।
৪২। দাওয়াতের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক।
৪৩। দা'য়ী তাহাজ্জুদে আল্লাহর কাছে খুব কান্নাকাটি করবে।
৪৪ । মাদউর (আহ্বানকৃতের) হৃদয়কে দাওয়াতের টার্গেট বানাবে।
৪৫। দা'য়ীর জন্য আরও একটি মৌলিক গুণ বা দাওয়াতের বুনিয়াদী মূলনীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম মূলনীতি হলো এই যে দা'য়ী কোনো লোভ লালসা ছাড়াই দাওয়াতের কাজ করবেন। যেমন পবিত্র কুরআনে নবীদের ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন-"আর আমি এ দাওয়াতের বদলে তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না।" আর না তোমাদের কোনো জিনিসের প্রতি আমার লোভ আছে।

দা'য়ীর আরো একটি বৈশিষ্ট্য [39]

আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করা। এক পর্যায় শাহাদাতের আগ্রহ সৃষ্টি হলে, বড় উপকার এটাই হবে, দা'য়ীর দৃষ্টি পার্থিব বস্তু থেকে সরে আল্লাহ তাআলার মহান সত্তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, যা দাওয়াতী কাজের জন্য একটি মৌলিক শর্ত। এজন্য যার দৃষ্টি থাকবে সম্পদের উপর কিংবা নিজের চেষ্টার ওপর অথবা নিজের আত্মার বা সাফল্যের ওপর তাকে এটা বোঝা উচিত পৃথিবীর সরদার নবীজীর প্রিয় ও বিশ্বস্ত চাচা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন,

اِنَّکَ لَا تَہۡدِیۡ مَنۡ اَحۡبَبۡتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰہَ یَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ۚ وَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُہۡتَدِیۡنَ ﴿۵۶﴾

অর্থ: "আপনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করতে পারবেন না বরং আল্লাহ্ যাকে চান তাকে হেদায়েত করেন।" [40]

দাঈর করণীয় কাজ [41]

যাকে দাওয়াত দেয়া হবে সে কোন ধর্মের অনুসারী কিংবা কোন চিন্তায় আচ্ছন্ন-এটা আগে দাঈকে জানতে হবে। পাত্র অনুযায়ী দাওয়াতের বিষয়, যুক্তি ও পন্থা শুরুতেই সাব্যস্ত করে নিতে হবে। একজন হিন্দু যে পদ্ধতিতে বুঝবে একজন খ্রীষ্টান সেভাবে বুঝবে না। আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটা ধর্মের লোকের জন্য আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সকল ধর্মের লোকদের কাছে আমরা আল-কুরআনের আয়াতকে অবশ্যই ব্যবহার করব। বিশেষ করে যখন দাওয়াতের কাজে ঘর থেকে বের হব তখন কয়েকটি আমল করতে পারি। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে দুই রাকাত নামায আদায় করব। আল্লাহর কাছে এ বিষয়ের সফলতা ও কবুলিয়্যাতের জন্য দোয়া করব। বিসমিল্লাহ বলে ঘর থেকে বের হব। আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখব, ভয় বলতে কোনো কিছু মনে জায়গা দেব না। প্রতিদিন বিভিন্ন তাসবিহ তেলাওয়াত করব। প্রতি রাতে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করব, নিয়ত থাকবে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যেন আল্লাহর সত্য দ্বীনের উপর চলে আসে এবং চিরস্থায়ী আগুন থেকে রেহাই পেয়ে যায়। তবে একই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যেন মনের ভেতর গর্ব, রিয়া, অহংকার না আসে। যদি এসে পরে তবে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, সমস্ত শক্তি আল্লাহর। আপনি তাঁর ক্ষমতা বলে তাঁর দেওয়া শক্তির মাধ্যমে চলছেন, তাঁর দেয়া ইলম অনুযায়ী কথা বলছেন। নিজেকে ছোট থেকে ছোট মনে করা এবং কাউকে অবজ্ঞা না করা। সহজ ও সাবলীল ভাষায় দাওয়াত দেওয়া। সন্দেহযুক্ত কথা থেকে বিরত থাকা চাই। যে পরিবেশে থাকতে হবে সেখানকার অন্যের দোষ খোঁজা থেকে বিরত থাকতে হবে। যখন কোন ভুল হতে থাকবে মনে করতে হবে শয়তান আপনাকে ধোঁকায় ফেলেছে। তখন আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবেন, আর এ ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণ বই পড়াশোনা করবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

[39] হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি পৃ:না-৩৫

[40] সূরা কাসাস: ৫৬

[41] সত্যের দাওয়াত পৃ:না – ৩৭

اِنَّکَ لَا تَہۡدِیۡ مَنۡ اَحۡبَبۡتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰہَ یَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ۚ وَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُہۡتَدِیۡنَ ﴿۵۶﴾

"আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।"[42]

দাওয়াতি কাজ গোপনে নিঃশব্দে করতে হবে এই ধারণা ভুল। বরং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েও দাওয়াতের কাজ করা যাবে। এতে কোনো ক্ষতি নেই। দাওয়াতের কাজে প্রিন্ট ও প্রচার মাধ্যমকেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কুরআন ছাড়া অন্য সমস্ত ধর্মগ্রন্থ পড়লে বুঝতে পারবেন যে, সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ বলেন, আর হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলেন কুরআন ছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের ভিত্তি নেই; এমন কি আরো মজার বিষয় হলো, যারা তা পালন করে তারাও বলতে বাধ্য হয় যে, তারাও সে ধর্ম সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না। তারা ধর্মগ্রন্থ পড়ে না; এমন কি অনেকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ দেখেওনি। তার জন্য আপনার উচিত হবে, আপনি যদি নিজেকে একজন দাঈ বলে গড়ে তুলতে চান তাহলে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে জানতে হবে, পড়তে হবে। এ প্রক্রিয়ায় পড়াশোনা করলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে ধারণা পাবেন। তাদের ভুল ধরিয়ে দিতে পারবেন এবং একমাত্র সত্যধর্ম ইসলাম প্রচার করা আপনার জন্য সহজ হবে। এতে অন্যরাও ইসলামের ছায়াতলে সহজে চলে আসতে উৎসাহিত হবে। সুতরাং একজন দাঈকে এই সমস্ত ধর্ম সম্পর্কে সমূহ জ্ঞান থাকা জরুরি, যেন বিধর্মী ভাইদেরকে তাদের সে ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে পারেন এবং আল্লাহ্র কুরআনের বাণী শুনিয়ে, ইসলামের সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরে বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে বুঝাতে পারেন। এখানেউল্লেখ করা ভাল, একজন দাঈ যদি হাফেজ, মাওলানা, ক্বারী হন এবং এর পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজিতেও কিছু পারদর্শী হন তবে তার দ্বারা সহজে একজন বিধর্মীকে পথ দেখানো অনেক সহজ হয়।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ ও প্রতিবেশীদের প্রথমে দাওয়াত দিতে পারি। ভোজসভার আয়োজন করে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারি। রাসূল (সা.) প্রথম প্রকাশ্যে ভোজের আয়োজন করে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَاصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ﴿۹۴﴾

-"অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।" [43]

বিভিন্ন বৈধ বিষয়ে আকর্ষণ কিংবা আগ্রহ জাগিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। এতে দোষ ধরা যাবে না। যদি সেই আকর্ষণ ও লোভের কারণে দাওয়াত কবুল করে চির জাহান্নাম থেকে কেউ মুক্তি পায়, তাহলে কত বড় সৌভাগ্যের বিষয় হবে! যদি কারো প্রচেষ্টায় হাজার হাজার লোক একথা স্বীকার করে নেয় যে, ইসলামই একমাত্র খাটি ধর্ম, ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম, অন্য সকল ধর্ম বাতিল, তবে তো অনেক বড় কামিয়াবি হবে, কিন্তু সব কিছু স্বীকারের পরও যদি কেউ-ই কালেমা পড়ে ইসলাম কবুল না করে, তবে কোন ফায়েদা নেই। অন্য দিকে পুরো এক জামাত এক বছর পর্যন্ত চেষ্টার পর যদি একজন কুষ্ঠরোগীকেও কালেমা পড়িয়ে ইসলাম কবুল করাতে পারে, তবে সেটিই উত্তম। হাজার হাজার লোকের ইসলামকে সত্যধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার চেয়ে একজন কুষ্ঠরোগীর কালেমা পড়ে ইসলাম কবুল করাই শ্রেয়।

পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলদের যেসব ঘটনা আছে সেসব ঘটনা দাঈরা বেশি বেশি পড়ি। কীভাবে তাঁরা উম্মতের কাছে দাওয়াত দিয়েছেন, তাঁদের ঘটনাগুলো আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। পড়লে জানতে পারব তাঁদের সে দাওয়াত যারা গ্রহণ করেছেন তারা সম্মানিত হয়েছেন আর যারা গ্রহণ করেনি তারা আল্লাহর গজবে নিপতিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বেশি বেশি পড়ি। হযরত মূসা (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা কীভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি যা যা চেয়েছেন আল্লাহ তা'আলা সবগুলো পূরণ করেছেন। এগুলো আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। কুরআনকে যদি অন্তরের মধ্যে ফিট করে নিতে পারেন তবে দেখবেন আপনার দাওয়াতী কাজের প্রতিটা মুহূর্তে প্রকাশ্য পথ-নির্দেশ পেয়ে যাবেন।

আমাদের ভেতর একটা ভয় কাজ করে যে, দাওয়াতের কাজে নামলে সংঘাত হবে, মানুষের রোষানলে পড়তে হতে পারে, মৃত্যু হতে পারে। আমরা যদি নবী-রাসূলদের জীবনী দেখি তবে দেখব, যারা তাঁদের বিরোধিতা করেছে বা নবী-রাসূলদের অত্যাচার করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে, আল্লাহর গজবে নিপতিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

[42] সূরা কাসাস, আয়াত ৫৬

[43] সূরা হিজর, আয়াত ৯৪

وَ لَا تَسۡتَوِی الۡحَسَنَۃُ وَ لَا السَّیِّئَۃُ ؕ اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ بَیۡنَکَ وَ بَیۡنَہٗ عَدَاوَۃٌ کَاَنَّہٗ وَلِیٌّ حَمِیۡمٌ ﴿۳۴﴾

"সমান নয় ভাল ও মন্দ। জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।" [44]

আরবের বর্বর যুগে রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাব। সমস্ত লোক তাঁর নবুওয়তের বিরোধিতা করেছে। তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, তবু পিছপা হননি। ধৈর্যধারণ করেছেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা পুরো আরব জাহানকে কবুল করেছেন। আজকে নবী নেই, কিন্তু তাঁর কাজের দায়িত্ব বর্তমান উম্মতের উপর। যেভাবে নবীগণ এই কাজ আগ্রাম দিয়েছেন আমাদেরও সেইভাবে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে সাহায্য বলেন আর সাফল্য বলেন ঠিক সেই সেই ভাবেই আমরা পাব ইনশাআল্লাহ।

আমরা আমাদের আমল ঠিক রাখি, আল্লাহ তা'আলার হক পরিপূর্ণ আদায় করি। কারো হক অপূর্ণ না রাখি। তাহলে কোন মানুষের অহেতুক শত্রুতা ও ছল-চাতুরি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنۡ تَمۡسَسۡکُمۡ حَسَنَۃٌ تَسُؤۡہُمۡ ۫ وَ اِنۡ تُصِبۡکُمۡ سَیِّئَۃٌ یَّفۡرَحُوۡا بِہَا ؕ وَ اِنۡ تَصۡبِرُوۡا وَ تَتَّقُوۡا لَا یَضُرُّکُمۡ کَیۡدُہُمۡ شَیۡئًا ؕ اِنَّ اللّٰہَ بِمَا یَعۡمَلُوۡنَ مُحِیۡطٌ ﴿۱۲۰﴾

"আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।" [45]

নওমুসলিমদের কালেমা পড়ানোতে বিলম্ব না করা [46]

একটি জরুরি আবেদন এই যে, যে সকল ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে আসেন কিংবা আপনার দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাদের কালেমা পড়ানো এবং মুসলমান বানানোর কাজে বিলম্ব করবেন না। আর তার থেকে ইসলাম কবুল করার অজুহাতের ব্যাপারে ইতস্তত করবেন না বরং তাকে তাড়াতাড়ি কালেমা পড়িয়ে দিন ।

নও মুসলিমদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা [47]

ইসলাম কবুল করার পর নওমুসলিমদের প্রশিক্ষণ দানের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো সময় কেবল কালেমা পড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর তাকে দ্বীন শেখানোর প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। তাই তারা পূর্বের এবং পরের জীবনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না পেয়ে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে। এজন্য এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটির দিকেও খুবই মনোযোগ দেয়া দরকার। যেখানে ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে এদের প্রশিক্ষণ দানের শাখাও প্রতিষ্ঠা করা দরকার বরং দাওয়াতী কাজের জন্য এটা জরুরি। বিভিন্ন মাদ্রাসায় এ কাজের জন্য নিয়ম মাফিক তাবলিগ শাখা প্রতিষ্ঠিত করা। আমি তো এর আগে একটি কথা বলতে চাই যে, মাদ্রাসার উন্নতি, সাফল্য ও এর বরকত বৃদ্ধির জন্য এবং শত্রুতা ও ফিতনা থেকে একে নিরাপদ রাখার জন্য দাওয়াতী শাখা বিশেষভাবে খুবই সক্রিয় ধরনের প্রতিষ্ঠা করা দরকার এবং এতে কাজ করার জন্য নিয়োজিত লোকদের প্রশিক্ষণ ও তা অর্জনের সাহায্য পাওয়া যাবে। এখানে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন, দাওয়াতের তো এই পবিত্র কাজের আরো কিছু লোক নিয়োজিত আছে, অনেক মুরব্বীর এ ব্যাপারে চিন্তাও আছে কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, এ কাজের যে পরিমাণ দায়িত্ব ছিল এর এক দশমাংশও এ জাতি আদায় করছে না, বিশিষ্টদের মধ্যে বিশিষ্টতম ব্যক্তিরাও এর গুরুত্ব বুঝতে পারেননি আর এ দায়িত্ব কম করে হলেও আদায় করেননি।

দাওয়াতি কাজ নিজের ঈমানের জন্য খুবই জরুরি [48]

---

[44] সূরা হা-মীম সেজদা, আয়াত ৩৪

[45] সূরা ইমরান, আয়াত ১২০

[46] হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি পৃ:৩৫

[47] প্রাগুক্ত, পৃ :৩৬

[48] হাদিয়ায়ে দাওয়াত, পৃ:৪৫

নিজের আত্মশুদ্ধি এবং ঈমানকে বাকি রাখার জন্য, এর থেকে সহজ পথ আর কিছুই হতে পারে না। অন্যকে ঈমানের দাওয়াত দেয়া, মানুষের মানবিক দুর্বলতা। বরং এক দিক থেকে মানবিক সৌন্দর্যও বটে। তা হলো যখন মানুষ কাউকে কোনো ভাল কাজের দাওয়াত দেয়। তখন সেই ভাল কাজে সে নিজেও প্রবেশ করে। আর যখন কোনো খারাপ কাজ থেকে মানুষ বাধা দেয়, তখন সে নিজেও ওই খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। তার নিজের জন্য ওই মন্দ কাজ হতে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহ.) (যিনি সেই সময়ের মুজাদ্দিদ ছিলেন) তিনি বলতেন, যখন নিজের মধ্যে কোনো জিনিসের কমি অনুভব হয়। তখন ওই চার বিষয়ে দুই জাগার মধ্যে ওয়াজ করে নেওয়া। তাহলে সেই কমতিটা পূরণ হয়ে যাবে। এই কথা একেবারে স্পষ্ট যে, যদি কেউ নিজের ঈমানকে বাকি রাখতে চায়, তাহলে তার জন্য সব চাইতে সহজ পদ্ধতি হলো, ঈমানের দাওয়াত দেয়া। অন্যের কাছে ঈমানের দাওয়াত পৌঁছানো একজন মানুষের প্রাকৃতিক এবং ব্যক্তিগত ভাবে মানষিক একটি দুর্বলতা হলো এই, তার উপরে সংস্রব ছোহবতের প্রভাব পড়ে। সে যেই পরিবেশে, যেই স্থানে যেই অবস্থায় জীবন-যাপন করে, সেই পরিবেশের ভালো মন্দ প্রভাব থেকে সে বাঁচতে পারে না। সংস্পর্শের বা ছোহবতের প্রভাবের বাড়বতা এমন সত্য। তা কখনও আস্বীকার করা যাবে না। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রামাণিত পশু-পাখি ও গাছ পালার সংস্পর্শও মানুষকে প্রভাবিত করে। যে অঞ্চলে কাটাওয়ালা গাছ বেশি, যেমন বাবলা গাছ ইত্যাদি সেখানকার মানুষের স্বভাব-চরিত্র অভ্যাস কঠিন হয়ে থাকে। যেসব অঞ্চলে ফল যুক্ত গাছ-পালা বেশি থাকে, ওখানকার মানুষের মধ্যে বিনয়ী ও তাওয়াজু পাওয়া যায়, এমনিভাবে পশু পাখির সংস্পর্শ ও অনেক প্রভাবিত করে। আমার সরল-সোজা এক বন্ধুর কথা মনে হলো। তার কাছে থেকে দ্বীনের ব্যাপারে হেকমতপূর্ণ একটি কথা জানতে পারি। কোনো এক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়, তা মীমাংসার এক মিটিংয়ে ওই বন্ধু উপস্থিত হন। দায়িত্বশীলগণ কোনো সমঝোতায় আসছিল না। সকল চেষ্টা ভেড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে একজন হাফেজ সাহেব কেঁদে উঠলেন। আর বলতে লাগলেন। আমরা হলাম দ্বীনের ঠিকাদার। আমাদের অবস্থা হলো কুকুরের মতো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন?
সে বলল, একটি মহিষ বা গরু যদি মারা যায়। সেই মৃত গরুটিকে একটি কুকুর খাচ্ছে। এমন সময় যদি অন্য একটি কুকুর চলে আসে, তাহলে সে তার খাওয়ার কথা ভুলে যাবে। আর তাকে ভাগিয়ে দেয়ার জন্য যুদ্ধ করবে। চাই সে নিজের জীবন দিয়ে দিব। যতক্ষণ পর্যন্ড না সে তাকে ভাগিয়ে দিবে। চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে শাড়িতে বসতে পারবে না। আমি তাকে বললাম, তাহলে তাকে কেমন হওয়া উচিত? সে বলল, ছাগলের মতো। আপনি যদি তার সামনে কিছু ঘাস বা খাবার দিয়ে দিন, আর একটি ছাগলের পালও যদি ছেড়ে দেন। তাহলে তারা পরস্পর মারামারি করবে না। সকলেই মিলে এক একটি পাতা শেষ করে দিবে। তার কথা থেকে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। কত সুন্দর হেকমতোপূর্ণ কথা। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এল, ইসলামে কুকুর পালা নিষেধ। আর ছাগল পালন সুন্নাত বলা হয়েছে। কারণ হিসেবে অনেকে হেকমতো থাকা সত্যেও এটিও একটি কারণ। ছাগলের সংস্পর্শে মানুষের মধ্যে মহবব্বত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, আর কুকুর ভালোবাসা দূর করে। হিংসা ও হাসাদ সৃষ্টি করে। আল- হে আমাদের হেফাজত করন।

দাওয়াত হলো দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপদের একটি পথ [49]

কুরআনে কারিম মুসলমানদেরকে মৌলিক ভাবে দুটি দলে বিভক্ত করেছে। আলাহর দল ও শয়তানের দল। সুপথ গামী ও বিপথ গামী। সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী। এই দুই দলের মধ্যে কারা শান্তি ও নিরাপদের হক দার? কুরআনে কারীম এ প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ كَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَ لَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَیُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۱﴾

যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় কর, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের সম্পর্কে আলাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক। [50]

আল্লাহ পাক আরো বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْۤا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۸۲﴾

49 প্রাগুক্ত, পৃ :৫৮

50 :আনআম-৮১

যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাস শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। [51]

ঈমান এবং জুলুম এ দু'টি স্ববিরোধ শব্দ। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এর উদাহরণ হলো এমন- আলো হয় তো অন্ধকার দূর হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, আলো যেই পরিমান হবে; ঠিক সেই পরিমাণ অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। এ জন্যই বলা হয়েছে, ঈমানদারগণই হলেন নিরাপদ ও হেদায়াত প্রাপ্ত। নিজ ঈমানের সাথে জুলুমকে যেন মিশ্রিত না করে।

ঈমান হলো আলো, আর জুলুম হলো অন্ধকার। আলো যত বেশী হবে অন্ধকার ততো কম হবে। অন্ধকার যদি বেশী হয় তাহলে আলো কমে যাবে। ঈমান যতো পরিপূর্ণ হবে, জুলুম ততো কমে যাবে। আর জুলুম যেই পরিমাণ বারবে ঈমান সেই পরিমান কমবে।

ঈমানদার তো সে, যে হকদারকে তার হক আদায় করে দেয়। জালেম তো সে, যে অন্যের হক নষ্ট করে। মানুষের উপর যেই হক অর্পিত হয়, তা দুই প্রকার হয়ে থাকে। আলাহর হক যা মহান। বান্দার হক যা আহাম গুরত্বপূর্ণ। আল্লাহর হক হলো তাকে যেই ভাবে মানা উচিৎ সেই ভাবে মানার হক আদায় করা। তার বিপরিত তার হকের সাথে কাওকে অংশিদার বানানো, যেমন তাঁর প্রভুত্তের ও বান্দিগীর মধ্যে তাঁর ইলমের ও গুনের এবং সত্বার সাথে কাওকে অংশিদার বানানোকে শরিক বলা হয়। নিজ খালেক- শ্রষ্টাকে তার হক না দেয়ার জন্য এটা সবচেয়ে বড় জুলুম।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَ هُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰهِ ؕؔ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ ﴿۱۳﴾

অর্থ: যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল: হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। [52]

আল্লাহর হকের পর সবচে বড় হক হলো, তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺএর হক। তা আদায় করা। অর্থাৎ ঈমানের হক ঐ সময় পর্যন্ড আদায় হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের খায়েশ বা ইচ্ছা সমূহ সুন্নাতের অধীনে না হবে। অর্থাৎ সুন্নাত তবিয়ত হতে হবে। তাই নবী কারীম ﷺবলেছেন – ততক্ষণ পর্যন্ত্ তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার খায়েশ দ্বীনের অধিনে না আনতে পারবে। যা আমি নিয়ে এসেছি।"

এর উদ্দেশ্য হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাত স্বভাবে পরিনত না হবে, ততক্ষণ পর্যড় ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। সুন্নাতকে তবিয়ত বানানোর উদাহরণ হলো মাছের চাহিদা হলো পানি। যদি তাকে পানি থেকে উপরে উঠিয়ে রাখা হয়, তাহলে সে ছটফট করতে থাকবে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। সে পানি ছাড়া বাঁচতে পারবে না। ঠিক মুমিনের অবস্থাও এমন হওয়া উচিত। পানির মতো সুন্নাত তার স্বভাব হতে হবে। সুন্নাত ছেড়ে দেয়ার গুনাহ দেখে তার ছটফটানি উঠবে। সুন্নাত ছাড়া পরিবেশ তার কাছে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত মনে হবে।

কোনো মুমিন যদি সীরাতের ও নবীজীর আদর্শের আলোকে সুন্নাতের পরিবেশ দেখতে চায়। তাহলে এ বাড়বতা তার সামনে সুস্পষ্ট হবে যে, দাওয়াতী পরিবেশ হলো আসল পরিবেশ। যেখানে মানুষ কুফর ও শিরকের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেখান থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে আনা হলো আসল নববী ও সুন্নাত ওয়ালা পরিবেশ। নবী ﷺএর হক আদায় করার জন্য, জররী হলো নিজ পরিবেশকে দাওয়াতী পরিবেশ বানানো। তাঁর প্রতিটি কাজে দাওয়াতের প্রাধান্য পাবে।

দাওয়াহ ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হক আদায় হয় না [53]

হক আদায় করার নাম ঈমান। এর বিপরিত হলো জুলুম। আল্লাহর হক হলো, আল্লাহর সত্বা, ও গুনাবলীর উপর ঈমান আন। তার হক আদায় কর। এর সাথে কাওকে অংশিদার না বানানো। এব্যাপারে ঈমানদারের চৌকশ হওয়া উচিৎ। শিরকের গন্ধেও যেন ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এবং সে যেন তার পরিবেশকেও শিরক মুক্ত করে। কারণ এই জুলুম থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[51] আনআম-৮২

[52] সুরা লুকমান-১৩

[53] হাদিয়ায়ে দাওয়াত, পৃ :৬৪

وَ اتَّقُوۡا فِتۡنَۃً لَّا تُصِیۡبَنَّ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡکُمۡ خَآصَّۃً ۚ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۲۵﴾

অর্থ: আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের ওপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ড কঠোর। [54]

এর দ্বারা বুঝা গেল, জুলুম হচ্ছে কোনো অন্যায় জানার পরও তা দূর করার চেষ্টা না করা। এ কারণে তাকে শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে। শিরক আল্লাহর নিকট খুবই বড় জুলুম।" এই বাণী অনুযায়ী হক আদায় করার জন্য শিরককারীকে একত্ববাদের দাওয়াত দেয়া খুবই জররী। এই দাওয়াতের মূল্যায়ন এবং শেষ ওসিয়তের হক আদায় করার ছাড়া, নবী মুহাম্মদ ﷺএর হক আদায়কারী হতে পারে না। বাকী মানুষের হক, কুফুর শিরক থেকে বাঁচানোর চেষ্টা ছাড়া, বান্দার হক আদায় হতে পারে না। হক আদায় করা যেহেতু ঈমান। আর তা না দেয়া হলো জুলুম। এমন ঈমান হবে যা জুলুম মুক্ত। ইসলাম একটি পথ। এ পথে চললে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে হেদায়াত পাওয়া যাবে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ لَمۡ یَلۡبِسُوۡۤا اِیۡمَانَہُمۡ بِظُلۡمٍ اُولٰٓئِکَ لَہُمُ الۡاَمۡنُ وَ ہُمۡ مُّہۡتَدُوۡنَ ﴿٪۸۲﴾

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। [55]

দাওয়াতী কাজকে নিজের মনে না করা আখেরাতের জন্য অসম্মান [56]

জালেমের পরিনাম এবং পরকালে তার লাঞ্চনার কথা কুরআনে এভাবে চিত্রাঙ্গন করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَ یَوۡمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰی یَدَیۡہِ یَقُوۡلُ یٰلَیۡتَنِی اتَّخَذۡتُ مَعَ الرَّسُوۡلِ سَبِیۡلًا ﴿۲۷﴾
یٰوَیۡلَتٰی لَیۡتَنِیۡ لَمۡ اَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِیۡلًا ﴿۲۸﴾
لَقَدۡ اَضَلَّنِیۡ عَنِ الذِّکۡرِ بَعۡدَ اِذۡ جَآءَنِیۡ ؕ وَ کَانَ الشَّیۡطٰنُ لِلۡاِنۡسَانِ خَذُوۡلًا ﴿۲۹﴾

জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস। আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দূর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়। [57]

এখানে কয়েকটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা লক্ষনীয় :
১. প্রথমত কোনো ব্যক্তি যতো বড়ই শিক্ষিত হোক, আর রুহানী শাইখ হোক, বা দার্শনিকই হোক না কেন। যদি নবীর ﷺপথ থেকে দুরে সরার দাওয়াত দেয়, তাহলে কুরআনের ভাষায় সে 'ফুলানা' (অমুক)-দের অন্তর্ভুক্ত হবে।
২. জালেম যেই জুলুমের কারণে সবচে বেশী লজ্জিত হবে। এবং সেই ভুলকে স্বীকার করে নিবে। এবং বের হয়ে নিজের হাত চিবাতে থাকবে। তা হবে রাসুল ﷺএর পথ থেকে দুরে থাকা এবং তাঁর অনুস্বরণ না করার করণে।
৩. যে কেউ রাসুল ﷺএর পথ ছাড়া, দুনিয়ার যে কোনো মানুষের অনুসরণই করুক না কেন, সে হবে জালেম। কেয়ামতের দিন সে খুবই লজ্জার সম্মুখিন হবে।
৪. এই আয়াতের মাধ্যে সাবিল শব্দ দ্বারা বিশেষ করে রেসালতের পথ বুঝানো হয়েছে।
রেসালতের পথ সম্পর্কে অন্য স্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلۡ ہٰذِہٖ سَبِیۡلِیۡۤ اَدۡعُوۡۤا اِلَی اللّٰہِ ۟ؔ عَلٰی بَصِیۡرَۃٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِیۡ ؕ وَ سُبۡحٰنَ اللّٰہِ وَ مَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ﴿۱۰۸﴾

---

[54] আনফাল-২৫

[55] সুরা আনআম- ৮২

[56] হাদিয়ায়ে দাওয়াত, পৃ :৬৫

[57] আল-ফুরকান -২৭-২৯

অর্থ: বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই। [58]

এখানে একথাও স্পষ্ট হওয়া উচিৎ। সীরাত এবং সাবীল দুটা পৃথক পৃথক জিনিস। সীরাত দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারন সোজা পথ। যেমন হাইওয়ে। আর সাবিল ঐ পথ, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য বিশেষ ভাবে বানানো হয়। প্রিয় নবী যা কিছু বলেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন। এব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন,

وَ مَا یَنۡطِقُ عَنِ الۡہَوٰی ؕ﴿۳﴾
اِنۡ ہُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی ۙ﴿۴﴾

৩. এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।
৪. কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। [59]

বুঝা গেল রেসালাতের পথ হলো বুঝে-শুনে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া। এছাড়া যত পথ আছে তা হলো, উমকের পথ, যা এই আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। যারা পরকালে লাঞ্ছিত হবে। এবং হাত কামরাবে।

বিজয়ের জন্য একটি পথ হলো দাওয়াত [60]

দুনিয়ার যে কোনো পথ আপনি বিজয় করতে চান, তা বিজয় করার জন্য দাওয়াতের পথ থেকে সহজ আর কোনো পথ নেই। আপনি যদি বিজ্ঞানীদের উপর বিজয় অর্জন করতে চান। তাহলে আপনাকে বিজ্ঞানীদের একটি টিম তৈরী করতে হবে। যারা বর্তমান বিজ্ঞানীদেরকে পরাস্ত করে দিবে। এটা অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন। এর বিপরীত এই বিজ্ঞানীদেরকে দাওয়াত দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা অনেক সহজ। কারণ তারা সৃষ্টিজীবের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা করতে করতে সে অস্থির হয়ে উঠছে। তারা মারেফতের একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছে গেছে। এখন আপনি যদি তাকে দাওয়াতের মাধ্যমে তার দৃষ্টির পর্দাকে সরিয়ে দেন, তাহলে তাওহীদ ও ইসলামের অন্যান্য শিক্ষার খুবই নিকটবর্তি হয়ে যাবে। এভাবে আপনি বিজ্ঞানের জগতে বিজয় অর্জন করতে পারবেন ।

এমনি ভাবে যদি আপনি রাজনীতির মধ্যে বিজয় অর্জন করতে চান। বর্তমান ইসলামী রাজনীতি করে মুসলমানদেরকে আয়ত্বে আনা খুবই কঠিন। এর বিপরিত রাজনীতিবিদদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মাধ্যমে এই ময়দানে বিজয় অর্জন করা খুবই সহজ। এমনিতেই আমাদের ধর্ম, কোনো মানুষের অন্তরকে বিজয় করা, তার হেদায়াতের মাধ্যম হওয়া, পুরো দুনিয়া বিজয় করা থেকে বেশী গুরত্ব দেয়।

খায়বার যুদ্ধে বিজয়ের প্রসিদ্ধ ঘটনা। রাসুলুলাহ ﷺ ঘোষণা দিলেন আজকে জিহাদের পতাকা ঐ ব্যক্তিকে দেয়া হবে, যার উপর আলাহ ও তার রাসুল রাজি। সকল সাহাবাগণ এই আশায় ছিলেন যে, এই পতাকা যেন আমার ভাগ্যে চলে আসে। যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের রাজির সুসংবাদের অধিকারী হয়ে যাই। রাসুল ﷺ আলী রা. কে ডেকে তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। এবং বললেন যাও। দাওয়াত দাও, আর জিহাদ কর। তোমার মাধ্যমে যদি একটি মানুষও যদি হেদায়াত পেয়ে যায়। তাহলে সব কিছু থেকে উত্তম। যার উপর সূর্য উদিত হয়। কেমন যেন পুরো পৃথিবীকে বিজয় করার থেকে একজন মানুষের হেদায়াত পেয়ে যাওয়া বেশী উত্তম ।

দাওয়াতকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য কি ভাবে বানাবে? [61]

এখানে একটি কথা মনে আসতে পারে যে, দাওয়াতের কাজ তো একটি বড় কাজ। এর জন্য প্রয়োজন অনেক জ্ঞান। প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার। এর জন্য যে কেউ এই কাজটি কিভাবে আঞ্জাম দিবে। তাকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাবে কী ভাবে? এর জন্য কয়েকটি কথার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

---

[58] ইউসুফ-১০৮

[59] আন-নাজম -৩-৪

[60] হাদিয়ায়ে দাওয়াত, পৃ :৬৭

[61] হাদিয়ায়ে দাওয়াত, পৃ :৬৯

প্রথম কথাতো হলো দাওয়াতের এই কাজ শিক্ষার চেয়ে বেশী প্রয়োজন অনন্তরের ব্যথা বেদনা। যেখানে নবীর ﷺদরদ সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে নিজেই কাজ করে ফেলা যায়। এই জন্য ‘ভালোবাসা নিজেই তোমাকে ভালোবাসার আদব শিখিয়ে দিবে’।

দাওয়াতকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানাবে কিভাবে? এবং বানানোর দ্বারা লাভ কি? আমাদের একজন মুহসিন একটি উদাহরণ দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যদি একটি হসপিটাল তৈরী করে। তো সেই হসপিটাল তৈরীর উদ্দেশ্য থাকে রুগির রোগ নিরাময় হওয়ার চেষ্টা করা। সেই হসপিটালের চিকিৎসা তো শুধু ডাক্তারই করবে। কিন্তু অন্যান্য আমলারাও চেষ্টা করবে যে, সেবাটা যেন তাদের রোগমুক্তির নীতিতে হয়। উদাহরণ স্বরপ ঝার দার ঝার দেয় এই পদ্ধতিতে, যাতে তার চিকিৎসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাবুর্চি যখন রান্না কওে, রোগীর সুস্থতার দিকে লক্ষ রেখে তার চাহিদা অনুযায়ী পাক করে। এ সব কিছুর উদ্দেশ্য হয় রোগীর রোগমুক্তি করার চেষ্টা।

এভাবে যদি পুরো জাতি একত্রিত ভাবে এই কাজকে নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়। যদিও এক শ্রেণীর মানুষ সরাসরি দাওয়াতী কাজের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিবে। জাতির অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ এর পরিবেশ তৈরী করবে। সকল কাজের উদ্দেশ্য বানাবে দাওয়াতকে। নবীজীর গোলাম হওয়ার শানতো এমনই হওয়া উচিৎ। মুসলমান দেহধারী দাওয়াত হয়ে যাবে। যদি জীবনের উদ্দেশ্য দাওয়াত বানিয়ে নেয়। তাহলে জীবনের প্রতিটি কাজ নিজে নিজেই দাওয়াত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা পেশ করতে চাই। আমার এক বন্ধু বড় একটি শহরের মসজিদে থাকতেন। তিনি দাওয়াতী কাজ করছেন। দাওয়াতের মানসিকতাও তৈরী হয়েগেছে। তার কাছে একজন মুসলমান মুসল্লি-এসে দু’আ চাইল, বলল যে, আমি একজন হিন্দু লালাজীর দোকান ভারা নিয়ে ছিলাম। এখন সে দোকান খালি করার জন্য মামলা করে দিয়েছে। আপনি দুআ করুন আমার যেন দোকান না ছাড়তে হয়। মাওলানা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কত দিন থেকে লালাজী সাবের দোকান ভাড়া নিয়েছেন? সে বলল আট বছর যাবত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন চুক্তি কত দিনের ছিল? সে বলল, এগার মাসের। এতে ইমাম সাহেব খুব রাগান্নিত হলেন। বললেন, আমি তো লালাজীর জন্য দুআ করব। কারণ বেচারা কি মনে করবে এ কেমন মুসলমান, যে চুক্তি রক্ষা করেনা। সে চলে গেল। এর পর অন্য এক মুসল্লি- এলো। যিনি লালাজীর দোকান ভাড়া নিয়েছে। এসে মাওলানা সাহেবকে বলতে লাগল, লালাজী তো দোকান ছেড়ে দিতে বলেছে এখন কি করতে পারি? মাওলনা সাহেব তাকেও কিছু প্রশ্ন করলেন, তার লেন-দেন ও চুক্তি ঐ পূর্বের ব্যক্তির মতোই ছিল। মাওলানা সাহেব পরামর্শ দিলেন, আপনি এখনই দোকান খালি করে দিন। কারণ এটা ঈমানের পরিপন্থী। কারণ রাসুল ﷺবলেছেন- “ **যার আমানত দারী নেই তার ঈমানও নেই।**

এই লোক বুঝতে পারলেন। পরের দিন দোকান খালি করে চাবিটা লালাজীর হাতে দিয়ে দিলেন। লালাজী খুবই আশ্চার্যন্নিত হলো। লালাজী বলল, কিব্যাপার? তোমাকে একবার বলার সাথে সাথে দোকান খালি করে দিলে? সে বলল, আমাদের মাওলানা সাহেব বলেছেন। তাই চাবি দিয়ে দিয়েছি। সে বলল, কোন মাওলানা সাহেব? তার সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দিও। সে মাওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করলো। লালাজী মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তাকে দোকান খালি করতে বললেন কেন? মাওলানা সাহেব বললেন, আমি তো তাকে ধর্মের একটি মাসআলাই বলেছি মাত্র। আমাদের ধর্ম বলে যখন চুক্তি পূর্ণ হয়ে যায় তখন দোকান খালিকরে দাও। লালাজী জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ! আপনাদের ধর্মে কি ভাড়াদাতা সম্পর্কেও বলা আছে? মাওলানা সাহেব তাকে বললেন, আমাদের ধর্ম জীবনের প্রতিটি জিনিসের শিক্ষা দেয়। এমন কি নখ কিভাবে কাটবে, আঙ্গুল কিভাবে চাটবে। ইত্যাদি। সব কিছু বলা আছে। লালাজী প্রভাবিত হলো। বলল, তাহলে এমন ধর্ম আপনারা অন্যকে দেন না কেন? মাওলানা সাহেব বললেন, আসলেই আমাদের ভুল হয়েগেছে। আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। এর পর দাওয়াত চলতে থাকে। এক সপ্তাহ ব্যাপী প্রতিদিন রাতে লালাজী মাওলানা সাহেবের কাছে এসে ধর্ম সম্পর্কে অনে কিছু জানতে পারে। আলাহর রহমতে এক সপ্তাহ পর সেই মসজিদেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পরের দিন সকালে সেই লোকের কাছে গেল যিনি দোকান খালি করে দিয়েছিল। চাবি দিয়ে বলল, আমি যতদিন বেচে থাকব, একই ভাড়ায় আপনি দোকান চালাতে থাকেন। তাই জীবনের উদ্দেশ্য যদি দাওয়াত থাকে তাহলে মানুষ দেহধারী দাওয়াত হতে পারবে। কখনো তো মৌখিক দাওয়াতের প্রয়োজনই আসে না।

সেই জাতি যার উপাধি ছিল উত্তম জাতি [62]

সীরাত ও দাওয়াতের ইতিহাস একথা বলে যে, মুসলিম জাতি যদি দাওয়াতের কাজ করা শুরু করে দেয়। তাহলে দুনিয়ার অধিকাংশ এরিয়া ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। আপনি নববী যুগের পর্যবেক্ষণ করুন। দেখবেন সেখানে ইসলামের বিরোধীতাকারী পাবেন, দুই শ্রেণীর মানুষকে । এক ঐইসমস্ত লোক, যারা ইসলামকে ভুল বুঝত এবং ভ্রষ্টধর্ম মনে করতো। দ্বিতীয়ত ঐ সমসৃ মানুষ, যারা ইসলামকে সত্য বলে জানতো। কিন্তু হিংসা, অহংকার ও নিজ নেতৃত্বে ভাটা পরার ভয়ে বিরোধিতা করত। প্রথত শ্রেণীর মানুষের কাছে যখন ইসলামের দাওয়াত

[62] হাদিয়ায়ে দাওয়াত, পৃ :৭২

দেয়া হয়েছে, এমন এক জনও পাওয়া যায়নি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছে হুজ্জত পরিপূর্ণ হওয়ার পর প্রত্যাখ্যান করার কারণে ধুলিস্যাত করে দেয়া হয়েছে।
এখনও যারা ইসলামের বিরোধিতা করছে। কাছে থেকেও যদি একটু পর্যবেক্ষণ করা যায়। তাহলে জানা যাবে তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বিরোধিতা করছে। তাদের সামনে যদি ইসলাম পেশ করা যায়। তাহলে সকলেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর যারা ইসলামকে সত্য জেনেও ইসলামের বিরোধিতা করবে, অহংকার ও হিংসার কারণে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও ধুলিস্যাৎ করে দিবেন।
হুজ্জত পুরণ সম্পর্কে আমার মুরশিদ পীর হযরত মাও. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. বলেছেন, ইতমামে হুজ্জাত হলো, মাদউ যেন বুঝতে পারে ইসলামই সত্য ধর্ম। সে যদি ইসলামকে সত্য মনে না করে তা হলে বুঝতে হবে আমরা দাওয়াতের হক আদায় করতে পারিনি। এতে আমাদের দুর্বলতা রয়ে গেছে। মাদউ যেন বোঝে এই ব্যক্তি আমার হিতাকাঙ্খি হিসেবেই দাওয়াত দিচ্ছে। কারণ কল্যান, দরদ আর ভালোবাসার সাথে যখন কাউকে দাওয়াত দেয়া হয়। তখন তার প্রভাব তার উপর পড়ে। এব্যাপারে আমার একটি ঘটনা মনে আসে। যা আমি আরমুগানে দাওয়াতেও বর্ণনা করেছি। আমার বড় মেয়েটি আমার কাছে এসে সময় নিল, তাকে সময় দিলাম। সে বলতে লাগল আব্বু বলুন তো যতো কাফের মুশরিক আছে, সবাই কি জাহান্নামে যাবে? আমি বললাম অবশ্যই যাবে। চিরকাল আগুনে জ্বলবে। সে বলল না চিরকাল জ্বলবে না। কখনো না কখনো আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আমি বললাম, না! কাফের মুশরিকরা চিরকাল জাহান্নামে জ্বলবে। আল্লাহ মিথ্যা বলেন না। তিনি তার কালামে পাকে বলেছেন,

اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغۡفِرُ اَنۡ یُّشۡرَکَ بِہٖ وَ یَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ مَنۡ یُّشۡرِکۡ بِاللّٰہِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِیۡدًا ﴿۱۱۶﴾

নিশ্চয় আল্লহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। [63]

একথা শুনে সে খুবই অস্থির হয়ে পড়ল। পেরেশান হয়ে সে তার কথা মোড়ঘুরিয়ে বলতে লাগল, আব্বু বলুন তো তাদের ভুলটা কি? আল্লাহই তো তাদেরকে হেদায়াত দেন নি।

এটা তো তাকদিরের মাসআলা, অনেক বড়দের জন্যই নিষেধাজ্ঞা আছে, সে তো ছোট মেয়ে। সে কী বুঝবে? আমি তার চিন্তাকে পরিবর্তন করতে বললাম। এরদ্বারা তোমার কি লাভ? তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর, আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করেছেন। এ কথা শুনে সে কাঁদতে লাগল। আর বলতে লাগল, আব্বু আমার তো মন চায় সকলের পরিবর্তে আমাকে জাহান্নামে জ্বালিয়ে দিক। আর কাউকে না জ্বালাক।

সে তো ছোট বাচ্চা ছিল, অল্প বয়সের কারণে সকলের পরিবর্তে নিজেকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালানোর জন্য প্রস্তুত। কেমন জানি নিজের চোখে জাহান্নামের আগুন অনুভব করছে, আবার মানবতাকে আগুন থেকে বাঁচানোর কেমন চিন্তা। এটাই ছিল আমাদের প্রিয় নবীর ﷺ দরদ, এটাই দাওয়াতের ময়দানের হাতিয়ার। যার ফলে কঠিন দুশমনও দেওয়ানা আর আশেক হয়ে যায়।
কুরআনে পাক রাসুল ﷺএর কথা এই ভাবে বয়ান করেছেন,

لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفۡسَکَ اَلَّا یَکُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۳﴾

তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। [64]

যদি কেউ রাসুল ﷺব্যাথাকে চাদর বানিয়ে দাওয়াতের ময়দানে কাজ শুর করে। ঠিক সেই ভাবে বিজয় দেখতে পাবে। সীরাতে পাকের ঘটনাবলীর আমলী নমুনা দেখতে পাবে। ব্যক্তি, জাতি, দেশের বিজয়কে নববী পদ্ধতি দেখতে পাবে। এর পর সামনে আসবে আবুবকর সিদ্দিক রা. ওমর ফারক রা. খালিদ বিন ওয়ালিদ রা., খাবক্ষাব বিন আরাত রা., মুসআব বিন উমায়ের রা. এর মতো ইসলামের বাহাদুরী। দেখা যাবে হযরত সুমাইয়্যা রা., ইয়াসির রা., এবং বেলাল রা., এর নমুনা।

---

[63] আন-নিসা ১১৬

[64] শুআরা-৩

দাওয়াতের ফিকির [65]

মোটকথা হলো, মুসলিম জাতির অধপতন, লাঞ্ছনা ও পরাধিনতার ব্যাপারে যারা ফিকির করে, তাদের এক মাত্র চিকিৎসা হলো দাওয়াত। এই জাতি দাতা হয়ে সম্মানের স্তর লাভ করতে পারবে। পুরো দুনিয়ার উপর দাপট ও প্রভাব সৃষ্টির জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো পথ নেই। পুরো দুনিয়াকে মুহাম্মাদী পয়গামের মাদউ বানিয়ে নিজের দাওয়াতী দায়িত্ব আদায় করা। কারণ দায়ীর সাথে প্রভাব থাকে, এর সাথে শান শওকাতের ফায়সালা করা হয়। এই জাতি যদি দায়ী না হয়। তাহলে তাদেরকে মাদউ হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীনের খাদেম কে এই দাওয়াত ও তাবলিগের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এই সত্য ধর্মকে সকল দ্বীনের উপর প্রাধান্য দেয়া দিয়েছেন। অতএব আমরা যদি দাওয়াতী কাজ না করি। তাহলে আমাদেরকে মাদউ বানাতে হবে। দুনিয়াতে ধর্মত্যাগী হওয়ার এক মাত্র কারণ দাওয়াত থেকে উদাসিনতা। আর এই জাতিকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ হলো দাওয়াত। এই জন্য প্রচার ছাড়া হেফাজত; আর আক্রমণ ছাড়া প্রতি রক্ষা সম্ভব নয়। এই জন্য দাওয়াতী কাজকে পছন্দ, আর এই কাজকে মৌখিক সমর্থন দেওয়াই জথেষ্ট নয়। বরং পুরো জাতিকে এই দাওয়াতী কাজকে জীবনের উদ্দেশ্য বানানো উচিৎ। এইজন্য কিছু লোককে এই কাজের জন্য পরিপূর্ণ সোপর্দ করে দিতে হবে। আর কিছু লোককে এইকাজের জন্য পরিবেশ তৈরী করতে হবে। উত্তম জাতি হওয়ার উদ্দেশ্যই হলো দাওয়াত। এর কারণই হলো দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়া। দাওয়াত ছাড়া মানুষের জিকির পরিপূর্ণ হতে পারে না। দাসত্বের হকও আদায় হয় না। সব ময়দানে সফলতার ভেদ হলো এখলাসের সাথে নবীর ﷺএত্তেবা দাওয়াতের কাজ ছাড়া সম্ভব নয়। ভীতু মানুষের জন্যও রয়েছে এর মধ্যে নিরাপদ পথ। আর বীরদের জন্যও রয়েছে পুরো দুনিয়া বিজয়ের পথ। এই জন্য পরকালের লাঞ্ছনা থেকে বাচার জন্য জররী যে, মানুষ তার কাছে অন্যের হক আদায় করে দিবে। জুলুম থেকে বাঁচার জন্য এবং আমার নবীর ﷺহক আদায় করার জন্য, বিদায় হজের জিম্মাদারী পালন করতে হবে।

দাওয়াতী কাজকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ মনে করতে হবে। জেনে বুঝে এই কাজের মুল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি মানুষের জন্য জররী এই কাজের সাথে জুড়ে থাকা। এখানে একটি হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে। যা ইবনে সাদ তারকাতে উলে- খ করেছেন। "রাসুল ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধির থেকে ফিরে এসে, পহেলা মুহাররমে মসজিদে নববীতে সকল সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে একটি ভাষণ দিলেন। যেখানে তিনি বলেছেন- "হে লোক সকল! আল্লাহ তাআলা আমাকে পৃথিবীর জন্য রহমত ও পয়গাম্বার বানিয়ে পাঠিয়েছেন। পুরো দুনিয়ার জন্য আমি রাসুল হয়ে এসেছি। আল্লাহর পয়গামকে সারা দুনিয়ায় পৌছিয়ে দিতে চাই। যাতে আল্লাহর হুজ্জত পুরো হয়ে যায়। আল্লাহর পয়গাম থেকে যেন কোনো মানুষ বঞ্চিত না হয়। যাও আল্লাহর উপর ভরসা করে, সারা দুনিয়ার বাদশার কাছে দাওয়াত পৌঁছিয়ে দাও। আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তোমাদের অস্তিত্বকে ওয়াক্বফ করে দাও। যেই লোকের লেন-দেনের মধ্যে শিরক আছে, তার জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম। তাদেরকে ভালো কাজের নসিহত কর।

এই বাণী শুনার পরও কোনো মানুষ দাওয়াত থেকে উদাসিন হয়ে থাকে কিভাবে?

নবী রাসূলগণের মূল দায়িত্ব [66]

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, প্রচার, নসীহত, ওয়াজ বা এককথায় আল্লাহর দীন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সকল নবী ও রাসূলের (আলাইহিমুস সালাম) দায়িত্ব। সকল নবীই তাঁর উম্মতকে তাওহীদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শির্ক, কুফর ও পাপকাজ থেকে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন।" [67]

---

[65] হাদিয়ায়ে দাওয়াত, পৃ :৭৬

[66] আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, পৃ:৮ (ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহি.)

[67] সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺকর্মকে আদেশ ও নিষেধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যত্র এ কর্মকে দা'ওয়াত বা আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا لَكُمۡ لَا تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدۡعُوكُمۡ لِتُؤۡمِنُواْ بِرَبِّكُمۡ﴾ [الحديد: ٨]

"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যে, তোমরা তোমাদের রবের ওপর ঈমান আন।" [68]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দায়িত্বকে দা'ওয়াত বা আহ্বান বলে অভিহিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]

"আপনি আপনার রবে দিকে আহ্বান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর ওয়াজ-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।" [69]

অন্যত্র এই দায়িত্বকেই তাবলীগ বা প্রচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ﴾ [المائدة: ٦٧]

"হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।" [70]

কুরআনুল কারীমে বারবার বলা হয়েছে যে, প্রচার বা পৌঁছানোই রাসূলগণের একমাত্র দায়িত্ব। নিচের আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿فَهَلۡ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾ [النحل: ٣٥]

"রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।" [71]

নূহ আলাইহিস সালামের জবানিতে বলা হয়েছে,

﴿أُبَلِّغُكُمۡ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمۡ﴾ [الاعراف: ٦٢]

"আমি আমার রবের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসীহত করছি।" [72]

সূরা আল-আ'রাফের ৬৮, ৭৯, ৯৩ নম্বর আয়াত, সূরা হুদ-এর ৩৪ নম্বর আয়াত ও অন্যান্য স্থানে দা'ওয়াতকে নসীহত বলে অভিহিত করা হয়েছে সূরা আশ-শুরার ১৩ আয়াতে বলেছেন,

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِ﴾ [الشورا: ١٣]

---

[68] সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৮

[69] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫

[70] সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৭

[71] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৫

[72] সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৬২

“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদের যার প্রতি আহ্বান করছেন তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়।” [73]

তাবারি, ইবন কাসির ও অন্যান্য মুফাসসির, সাহাবী-তাবেঈ মুফাসসিরগণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো দীন পালন করা। আর দীন পরিপূর্ণ পালনের মধ্যেই রয়েছে আদেশ, নিষেধ ও দা'ওয়াত। এ অর্থে কোনো কোনো গবেষক দীন পালন বা নিজের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যদের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াতকেও ইকামতে দীন বলে গণ্য করেছেন।

উম্মতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য [74]

দা'ওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা নসীহতের এই দায়িত্বই উম্মতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤﴾ [ال عمران: ١٠٤]

“আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।” [75]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,
﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١١٠﴾ [ال عمران: ١١٠]

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।” [76]
প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

﴿يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١١٤﴾ [ال عمران: ١١٤]

“তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।” [77]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة: ٧١]

---

[73] সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১৩

[74] আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, পৃ: ৯

[75] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪

[76] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০

[77] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৪

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [78]

সূরা তাওবার ১১২ আয়াতে, সূরা হজের ৪১ আয়াতে, সূরা লুকমানের ১৭ আয়াতে ও অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত মুমিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।
এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান, সালাত, সাওম ইত্যাদি ইবাদতের মতো সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অন্যতম কর্ম। শুধু তাই নয়, মুমিনদের পারস্পারিক বন্ধুত্বের দাবি হলো যে, তারা একে অপরের আন্যায় সমর্থন করেন না, বরং একে অপরকে ন্যায়কর্মে নির্দেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। এখানে আরো লক্ষণীয়, এ সকল আয়াতে ঈমান, সালাত, যাকাত ইত্যাদির আগে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা মুমিনের জীবনে এর সবিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।
এই দায়িত্বপালনকারী মুমিনকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣﴾ [فصلت: ٣٣]

"ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিমদের একজন।" [79]

আমরা দেখেছি যে, আদেশ, নিষেধ বা দা'ওয়াত-এর আরেক নাম নসীহত। নসীহত বর্তমানে সাধারণভাবে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হলেও মূল আরবিতে নসীহত অর্থ আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনা। কারো প্রতি আন্তিরকতা ও কল্যাণ কামনার বহিঃপ্রকাশ হলো তাকে ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ কাজটি মুমিনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্যতম দায়িত্ব, বরং এই কাজটির নামই দীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ قَالَ للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

"দীন হলো নসীহত। সাহাবীগণ বললেন, কার জন্য? বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, মুসলিমগণের নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।" [80]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নসীহতের জন্য সাহাবীগণের বাই'আত তথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে জারির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুগিরা ইবন শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবী বলেন,

«بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّمَ عَلى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسْلِمٍ»

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাই'আত বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছি, সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুসলিমের নসীহত (কল্যাণ কামনা) করার ওপর। [81]
রতেন। উবাদাহ ইবন সামিত ও অন্যান্য সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন,

---

78 সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১

79 সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩

80 মুসলিম

81 বুখারী

«إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ..وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ عَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلا نَخَافُ لَومَةَ لائِمٍ فِيهِ»

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত করি আনুগত্যের... এবং সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের এবং এ কথার ওপর যে, আমরা মহিমাময় আল্লাহর জন্য কথা বলব এবং সে বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দা বা গালি-গালাজের তোয়াক্কা করব না।" [82]

আল্লাহর শাস্তি [83]

মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও ফরিযা হলো 'দাওয়াত'। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর বান্দাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো। মুসলমানরা যদি এই গুরুদায়িত্ব আদায় না করে, তাহলে তার অবস্থা কী হতে পারে, এ বিষয়ে পাঠকদের খেদমতে কিছু আলোচনা পেশ করছি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমে মানুষের দুটি অবস্থার আলোচনা করেছেন।
(১) সম্মানের অবস্থা। (২) লাঞ্ছনার অবস্থা। প্রথম অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لِلّٰهِ الۡعِزَّۃُ وَ لِرَسُوۡلِهٖ وَ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ لٰکِنَّ الۡمُنٰفِقِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ٪﴿۸﴾

অর্থ: ইজ্জত সম্মান তো শুধু আল্লাহর ও তাঁর রাসুল এবং মু'মিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না। [84]
দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমে বলেন ,

وَ ضُرِبَتۡ عَلَیۡهِمُ الذِّلَّۃُ وَ الۡمَسۡکَنَۃُ ٭ وَ بَآءُوۡ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ

অর্থ : আর তাদের ওপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষারলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। [85]

কুরআনে কারীমে দুই প্রকার জাতির ওপর শাস্তির আলোচনা করেছেন। প্রথম প্রকার হলো অস্বীকারকারী কাফের। অর্থাৎ যারা আল্লাহর পয়গামকে মিথ্যা বলেছে, অস্বীকার করেছে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, আহলে কিতাবিদের মধ্যে যারা পয়গম্বরদের দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে একসময় তারা নাফরমান হয়ে যায়। এই আয়াতে যাদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, তারা হলো ওই সব মুসলমান যাদেরকে আমরা বনী ইসরায়েল বলে চিনি। এখানে ভাববার বিষয় হলো তাদের এমন কোন্ অপরাধ ছিল, যার কারণে তাদের ওপর শাস্তি নেমে এসেছে? আমাদের পক্ষ থেকেও যদি একই অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে কি আমাদেরকে এই শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে? না, কখনও না। আল্লাহর আদালতের মূলনীতি হলো একটি অপরাধের জন্য একটি শাস্তি নির্দিষ্ট। ওই অপরাধ যেই করুক তাকে ওই শাস্তিই দেওয়া হবে। যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাহাহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি ফাতেমাও চুরি করে, তাহলে তারও হাত কেটে দেওয়া হবে। এখন আমরা আলোচনা করবো, কী কারণে পূর্ববর্তী লোকদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

শাস্তির কারণ [86]

আমরা দেখতে পাই, দুনিয়াতে মানুষ যখন তার ওপরস্থ কর্মকর্তার অবাধ্য হয়, তখন তাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। ঠিক বান্দা যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উপাসনা করে, অথবা তার অবাধ্য হয়, তখন তিনি শাস্তি দেন। আমরা কোরআনকে নিয়ে গবেষণা করলে জানতে পারব যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতিকে তিন কারণে শাস্তি দিয়েছেন।
১। অন্যায় কাজ থেকে বাধা না দেয়া আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

---

[82] আহমাদ

[83] আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, পৃ:২০

[84] সূরা মুনাফিকুন -৮

[85] সুরা বাকারাহ -৬১

[86] আল্লাহর শাস্তি, পৃ:৫ (দায়ী মুফতি যুবায়ের আহমদ হাফি.)

كَانُوۡا لَا یَتَنَاهَوۡنَ عَنۡ مُّنۡكَرٍ فَعَلُوۡهُ ؕ لَبِئۡسَ مَا كَانُوۡا یَفۡعَلُوۡنَ ﴿۷۹﴾

অর্থ: তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। [87]

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম, পূর্ববর্তী উম্মতেরা মানুষকে মন্দ কাজ হতে বাধা দিতো না। এবার আমরা দেখি আমরাও একই অপরাধে অপরাধী কি না। সবচেয়ে বড় মন্দ কাজ হচ্ছে শিরিক । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰهِ ؕؔ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ ﴿۱۳﴾

অর্থ: তুমি আল্লাহর সাথে শিরিক করো না, নিশ্চয় শিরিক মহা অন্যায় । [88]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنۡ یُّشۡرِکۡ بِاللّٰهِ فَقَدۡ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیۡهِ الۡجَنَّۃَ وَ مَاۡوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِیۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ﴿۷۲﴾

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাতকে হারাম করে দেন। তার আবাসস্থল জাহান্নাম আর যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নাই । [89]

আমার সামনে যারা শিরিক করছে, মুর্তির পূজা করছে, তাদেরকে শিরিক নামের মন্দ কাজ থেকে বাঁধা দিই কি না? ইত্যাদি। মোটকথা পূর্ববর্তী যেসব কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, সেই কারণগুলোর মধ্যে ১নং কারণটি আমাদের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমরা নিজেরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করব না এবং অন্যদেরকে শিরিক করতে দেবো না । আর তাদেরকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করব। পূর্ববর্তী উম্মতের শাস্তি দেওয়ার দ্বিতীয় যেই কারণই ছিল, তা হলে সত্যকে গোপন করা ।

২। সত্য গোপন করা । আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَکۡتُمُوۡنَ مَاۤ اَنۡزَلۡنَا مِنَ الۡبَیِّنٰتِ وَ الۡهُدٰی مِنۡۢ بَعۡدِ مَا بَیَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِی الۡکِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِکَ یَلۡعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلۡعَنُهُمُ اللّٰعِنُوۡنَ ﴿۱۵۹﴾ۙ

অর্থ:নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাজিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও। [90]

উক্ত আয়াতে আল্লাহর বিধানগুলো গোপন করতে নিষেধ করেন । যারা তা করবে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন । আমরা এই আয়াত থেকে জানতে পারলাম যে, পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর যেই কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তার দ্বিতীয় কারণ হলো সত্যকে গোপন করা । এখন দেখার বিষয় হলো আমরা এই অপরাধে অপরাধী কি না? আমরাও এই অপরাধে অপরাধী। আমরাও সত্যকে গোপন করছি । যেমন মুহাম্মদ ﷺ হলেন, হিন্দু-মুসলিম সকল মানুষের নবী। এই সত্য কথাটি কি আমরা হিন্দু, খ্রিস্টান অমুসলিম ভাইদের কাছে বলেছি? তাদের কাছে কি এই দাওয়াত পৌঁছিয়েছি? যদি উত্তর হয় না; তাহলে আমরা সত্যকে গোপন করলাম কি না?

এমনিভাবে কুরআন হলো সকল মানুষের জন্য। এই সত্য কথাটি কি অমুসলিমদের মাঝে পেশ করেছি? কোনো অমুসলিমদেরকে বলেছি? ভাই! কুরআন হলো আপনারোও কিতাব। আপনাদের জন্য মুক্তির পথনির্দেশিকা। যদি না বলে থাকি, তাহলে আমরা এই সত্য বিষয়টি গোপন করলাম কি না? হ্যা অবশ্যই এই সত্য বিষয়টি গোপন করেছি । দিন কি কোনো

[87] সুরা মায়েদা-৭৯

[88] সুরা লুকমান-১৩

[89] সুরা মায়েদা- ৭২

[90] সূরা বাকারা: আয়াত : ১৫৯

ইসলাম হলো মুসলিম অমুসলিম সকল মানুষের জন্য। আমরা কি অমুসলিমদের কাছে এই সত্য পয়গামটি পৌঁছিয়েছি? যদি না পৌঁছাই, তাহলে এই সত্য বিষয়টি গোপন করলাম কি না? আমরা যদি ভালোভাবে আল্লাহর বিধানগুলোর প্রতি খেয়াল করি, তাহলে দেখব, এমন অনেক সত্য বিষয় আছে, যা আমরা গোপন করছি। অন্য মানুষের কাছে প্রকাশ করছি না। আর পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে শাস্তির দ্বিতীয় কারণ হলো সত্যকে গোপন করা। আসুন আমরা সত্যকে মানুষের কাছে প্রকাশ করি যা আমরা গোপন করছি। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমিন!! পূর্ববর্তী উম্মতকে যে কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তার তৃতীয় কারন হলো আল্লাহ বিধি বিধান থেকে উদাসীন হওয়া।

৩। আল্লাহ তাআ'লার বিধিবিধান থেকে উদাসীন হওয়া,

فَلَمَّا نَسُوۡا مَا ذُکِّرُوۡا بِہٖۤ اَنۡجَیۡنَا الَّذِیۡنَ یَنۡہَوۡنَ عَنِ السُّوۡٓءِ وَ اَخَذۡنَا الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا بِعَذَابٍۭ بَئِیۡسٍۭ بِمَا کَانُوۡا یَفۡسُقُوۡنَ ﴿۱۶۵﴾

অর্থ: অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের নাফরমানির দরুণ। [91]

প্রিয় পাঠক! আমরা এই আয়াত থেকে জানতে পারলাম যে, পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর আযাব আসার তৃতীয় কারণ হলো আল্লাহর আহকামকে অবজ্ঞা করা। উদাসীন হওয়া। এখন দেখার বিষয় আমরাও ওই রোগে রোগী কি না? আমরা নামাজ থেকে উদাসীন। রোজা থেকে উদাসীন। হজ্জ থেকে উদাসীন, আল্লাহর আহকাম থেকে উদাসীন।
এসব কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর শাস্তি দিয়েছিলেন। তখনই মানুষ উদাসীন হয় যখন মানুষ কোনো কিছু ভুলে যায়।

শাস্তির ধরণ [92]

আল্লাহা তাআ'লা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন বিভিন্নভাবে, কখনো আযাবের ভয় দেখিয়ে, আবার কখনো পূর্বের সম্প্রদায়ের শাস্তির ঘটনা বর্ণনা করে আমাদেরকে হুঁশিয়ারি বার্তা জানিয়েছেন। তার কিছু বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো। আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতীকে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَقَدۡ اَہۡلَکۡنَا الۡقُرُوۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ لَمَّا ظَلَمُوۡا ۙ وَ جَآءَتۡہُمۡ رُسُلُہُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ وَ مَا کَانُوۡا لِیُؤۡمِنُوۡا ؕ کَذٰلِکَ نَجۡزِی الۡقَوۡمَ الۡمُجۡرِمِیۡنَ ﴿۱۳﴾

অর্থ: আমি অবশ্যই তোমাদের পূর্বে বহু অধিবাসীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এ কারণে যে তারা যুলুম করেছিল। অথচ রাসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে। [93]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা পূর্ববর্তী জাতিদের শাস্তির কারণ বলেছেন, তাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের আনীত বিধানসমূহ অমান্য ও অস্বীকার করার দরুণ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। আমরা জানি। আল্লাহ তাআ'লার কাছে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ কাজ হলো, তাঁর সাথে শিরিক করা। এই দাওয়াত নিয়েই সমস্ত নবী রসূলরা এসেছেন। যারা তাদের দাওয়াত অমান্য করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আযাবে নিপতিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তোমাদেরকে এধরাতে প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমরা কীরূপ আমল কর। অর্থাৎ আমরা শিরিক থেকে নিজে বাঁচবো এবং অন্যকে বাচাবো। ইনশাআল্লাহ পূর্ববর্তী উম্মতকে তিন ধরনের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[91] আরাফ : আয়ত : ১৬৫

[92] আল্লাহর শাস্তি, পৃ:৯

[93] ইউসুন-১৩

قُلۡ ہُوَ الۡقَادِرُ عَلٰۤی اَنۡ یَّبۡعَثَ عَلَیۡکُمۡ عَذَابًا مِّنۡ فَوۡقِکُمۡ اَوۡ مِنۡ تَحۡتِ اَرۡجُلِکُمۡ اَوۡ یَلۡبِسَکُمۡ شِیَعًا وَّ یُذِیۡقَ بَعۡضَکُمۡ بَاۡسَ بَعۡضٍ ؕ اُنۡظُرۡ کَیۡفَ نُصَرِّفُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَفۡقَہُوۡنَ ﴿۶۵﴾

অর্থ: আপনি বলুন: তিনি সক্ষম তোমাদের ওপর কোন শাস্তি প্রেরণ করতে, উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে, অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিতে এবং এককে অন্যের ওপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাতে। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি, যাতে তারা বুঝে নেয়। [94]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ও বান্দার অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তিনি আমাদের চতুর্দিক থেকে আযাব দিতে সক্ষম। আমাদেরকে বিভিন্য দলে বিভক্ত করে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়ে দিয়ে আমাদেরকে অন্যান্য জাতির ন্যায় সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারেন। যার উদাহরণ কুরআনে বিদ্যমান।

মোট কথা এই আয়াতে তিন ধরনের শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। (১) আসমানি শাস্তি (২) জমিনি শাস্তি (৩) পরস্পর ঝগড়া- বিবাদ। কিন্তু প্রথম দুই ধরনের শাস্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর বরকতে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বাকি একটি শাস্তি রয়ে গেছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে,

سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعنى واحدا. سألت ربي ان لا يهلك امتي بالسنة فأعطانيها وسألت ان لا يهلك أمتي بالغرق. فأعطانيه وسألت ان لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.

আমি আল্লাহর কাছে তিনটি দু'আ করেছি। দুটি কবুল হয়েছে এবং একটি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন আমার এই দু'আটি কবুল হয়ছে এর পর দু'আ করলাম আমার উম্মতকে যেন ঝড়ে তুফানে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। আমার এই দু'আও কবুল করলেন। দু'আ করলাম আল্লাহ যেন আমার উম্মতকে পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত না করেন। আমার এই দু'আটি ফিরিয়ে দেয়া হলো। [95]

উল্লেখিত হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, শেষ প্রকারের শাস্তি এই উম্মতের মধ্যে থেকে যাবে। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বিরোধ, এখতেলাফ এবং মতানৈক্য, বিভক্তি ইত্যাদি। আপনি যদি ইসলামের ইতিহাস অধ্যায়ন করে থাকেন। তাহলে

দেখবেন, মুসলমানদের ওপর তাতারীদের নির্যতনের উত্থান পতনের যে কারণ ছিল তা হলো, সে সময় মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব এবং নিজেদের মধ্যে কঠিন এখতেলাফ যা ছিল শাস্তির চুড়ান্ত অবস্থা। ফলে ওখানকার এক গ্রুপ খ্রিস্টানদের সাথে মিলে তার প্রতি পক্ষকে হত্যা করে। দেয়। পরবর্তীতে যারা খ্রিস্টানদের সঙ্গ দিয়ে ছিল তাদেরকেও শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে স্পেন থেকে মুসলমানদের পতন ঘটে। আমরাও যদি নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া করি। দ্বন্দ্বেন্দে লিপ্ত থাকি। আর আমাদের দায়িত্ব আদায় না করি তাহলে আমরাও সেই শাস্তির স্বীকার হবো।

একবার রাসুলুল্লাল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر اوليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم

ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার জান, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অবশ্যই অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে, যদি এমন না করতে থাক, তাহলে তোমাদের ওপর জালিম শাসক চাপিয়ে দেয়া হবে। তখন তোমাদের মধ্যে ভাল লোকেরা দু'আ করবেন কিন্তু তা কবুল করা হবে না।" [96]

---

[94] আনআম:৬৫

[95] মুসনাদে আহমাদ-১০১৭

[96] মুসনাদে আহমাদ-২৩৩২৭

একটু ভাবলেই দেখতে পারব, আজ আমাদের ওপর কোন ধরনের ব্যক্তির শাসন চলছে। আল্লাহ তা আলা খারাপ লোকদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেন নি? এটা আল্লাহ তা'আলার অটল ও অনড় বিধান যে, যদি আমরা আমাদের দায়িত্বের অবহেলা করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিধান আমাদের ওপর প্রয়োগ করবেন।

আমরা দাওয়াতের অনিবার্য দায়িত্বটি ছেড়ে দিয়েছি। ফলে দুনিয়ার সবচাইতে খারাপ জাতিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ভারতে ১৯৯২ সনে ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ শাহাদাতের এবং ২০০২ সালে গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে। ঐ সময় বিশ্বের সকল মুসলমানের মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় এমন কোন্ ব্যক্তি ছিল, যিনি দু'আ করতে গিয়ে চোখের অশ্রু ঝরায়নি? দুনিয়ার এমন কোন্ স্থান ছিল, যেখানে দু'আ না করা হয়েছে।

হেরেমে মক্কা ও হেরেমে মদিনায় দু'আ করা হয়েছিল। পবিত্র রমযান মাসে স্থানে স্থানে দু'আ করা হয়েছে কুনুতে নাযেলা পড়া হয়েছে। কিন্তু কোন দু'আ আল্লাহর রহমত ও দয়াকে মুতাওয়াজ্জুহ করতে পারেনি। সম্ভবত এর কারণ এটাই ছিল যে, আমাদের অপরাধের কারণে আল্লাহর অটল বিধান ও নিয়মের বাস্তবাতা দেখিয়েছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مروبالمعروف وانهو عن المنكر قبل أن تدعوائم لا يستجاب لكم

তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান কর। ওই সময়ের পূর্বে যখন তোমরা দু'আ করবে কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য হবে না। [97]

কুরআনে হাকীমে এই জন্যই বনী ইসরাইলের ওপর লানত করা হয়েছে। কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾

বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। [98]

অন্য হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن جرير بن عبد الله قال ما من رجل يكون في قوم يعمل بينهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغيروا لاصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا،

যারির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কোনো ব্যক্তি যখন তার স্বজাতির মধ্যে গোনাহর কাজে লিপ্ত থাকে, আর ওই জাতি তাকে গুনাহর কাজ থেকে ফিরাতে সক্ষম, কিন্তু তারা তাকে ফিরালো না, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে আজাব দ্বারা গ্রেপ্তার করবেন। [99]

আমরা যাদি এ কাজ না করি তাহলে আল্লাহ তা'আলা অন্য জাতি নিয়ে আসবেন।

وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

---

[97] তাবরানী

[98] সুরা মায়েদা ৭৮

[99] সুনানে আবু দাউদ

যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না। [100]

এই আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, আমরা আল্লাহর দাসত্ব বা না করি, তাতে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না। কারণ তিনি আমাদের মোটেও মুখাপেক্ষি না। আর আমরা যদি তার হুকুম মেনে না চলি, তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করে এমন এক জাতি পাঠাবেন যারা আমারে মত হবে না। আমাদের চেয়ে ভালো হবে। তারা শিরিক করবে না এবং আল্লাহকে মানবে। এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিন।

সাধারণ শাস্তি বনাম বিশেষ শাস্তি [101]

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বা এককথায় আল্লাহর পথে দা'ওয়াত একটি ফরযে আইন বা ফরযে কিফায়া ইবাদত। সাধারণভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, এ ইবাদত পালনে অবহেলা করলে এ জাতীয় অন্যান্য ইবাদত পালনে অবহেলার ন্যায় গোনাহ হবে। তবে কুরআন হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এ ইবাদত পালনে অবহেলা করার জন্য, বিশেষত, অন্যায় কাজ দেখে সাধ্যমত তার আপত্তি ও সংশোধন না করার জন্য বিশেষ ও কঠিন শাস্তি রয়েছে। শাস্তিগুলো নিম্নরূপ:

দুনিয়াবী গযব [102]

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুগে যুগে যারা তাঁদের সমাজের মানুষদেরকে অন্যায় পরিত্যাগ করতে আহ্বান করেছেন, এসব দা'ঈ ও মুবাল্লিগকে আল্লাহ গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আর পাপীরা ও পাপের নীরব সমর্থক পুণ্যবানরা শাস্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। ইয়াহূদীদের জন্য শনিবারে কোনোরূপ কর্ম করা নিষেধ ছিল। শনিবার কোনো জেলে মৎস শিকার করত না। এজন্য নদীতে প্রচুর মাছ দেখা যেত। তাদের মধ্যকার একদল মানুষ হিলা বাহানা করে শনিবারে জাল ফেলে রাখতে শুরু করল, যেন রবিবারে মাছ ধরতে পারে। তখন ভালো মানুষের একদল তাদের নিষেধ করেন আর একদল বলেন, এসব মানুষের ধ্বংস অনিবার্য, এদের নিষেধ করে কি লাভ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذۡ قَالَتۡ أُمَّةٞ مِّنۡهُمۡ لِمَ تَعِظُونَ قَوۡمًا ٱللَّهُ مُهۡلِكُهُمۡ أَوۡ مُعَذِّبُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗاۖ قَالُواْ مَعۡذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٦٤ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيۡنَا ٱلَّذِينَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذۡنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِۢ بَـِٔيسِۢ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ ١٦٥﴾ [الاعراف: ١٦٤، ١٦٥]

“আর স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলল, তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ এমন কওমকে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আযাব দেবেন? তারা বলল, তোমাদের রবের নিকট ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আর হয়তো তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল তখন আমরা মুক্তি দিলাম তাদেরকে যারা মন্দ হতে নিষেধ করত। আর যারা যুলুম করেছে তাদেরকে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ তারা পাপাচার করত। [103]

এখানে আমরা দেখছি যে, যারা অন্যায় থেকে নিষেধ করেছেন শুধু তাদেরকেই আল্লাহ গযব-শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

সূরা আল-মায়েদার ৭৮-৭৯ আয়াতে ও সূরা হূদ-এর ১১৬ আয়াতেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।
উপরের আয়াত থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, ওকে বললে কোনো লাভ হবে না, এরূপ ধারণা করে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। কারণ,

প্রথমত: লোকটি কথা শুনবে না একথা নিশ্চিত জানলেও আমাকে বলতে হবে, আমার দায়িত্ব হলো বলা, আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

দ্বিতীয়ত: লোকটি কথা শুনবে না, একথা এভাবে নিশ্চিত ধারণা করাও ঠিক নয়। কারণ, হয়ত আন্তরিকতাপূর্ণ ভালো কথাটি তার মনে প্রভাব ফেলতে পারে।

---

[100] মুহাম্মদ- ৩৮

[101] আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, পৃ:২০

[102] প্রাগুক্ত,পৃ:২১

[103] আল-আ'রাফ,: ১৬৪-১৬৫

দা'ওয়াতে অবহেলার জাগতিক শাস্তির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ النَّاسَ إِذَا رأوا الْمُنْكَرَ لا يُغَيِّرُونَهُ أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بعقَابِهِ»

"যখন মানুষেরা অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না তখন যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহর শাস্তি তাদের সবাইকে গ্রাস করবে।" [104]

দো'আ কবুল না হওয়া [105]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»

"যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই কল্যাণের আদেশ করবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে আল্লাহ অচিরেই তোমাদের সবার ওপর তাঁর গযব ও শাস্তি পাঠাবেন, তারপর তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না বা তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে না।" [106]

সামাজিক শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া [107]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইসরাঈল সন্তানদের (ইয়াহূদী জাতির) মধ্যে সর্বপ্রথম দুর্বলতা আসলো এভাবে যে, তাদের সমাজের একজন অপরজনকে (অন্যায় কাজে জড়িত) দেখলে বলত, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং যা করেছেন তা পরিত্যাগ করুন, একাজ আপনার জন্য বৈধ নয়। অতঃপর পরদিন তাকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখত, কিন্তু (খারাপ লোকটির) অন্যায় তাকে (সৎলোকটিকে) তার সাথে সমাজিক সম্পর্ক রাখতে বাধা দিত না। অন্যায়ে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সে তার সাথে একত্রে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ও সামাজিকতা রক্ষা করে চলত। যখন তারা এরূপ করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাদের সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য নষ্ট করে দেন, তাদের মধ্যে বিভেদ, কলহ ও বৈরিতা সৃষ্টি করে দেন।

একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারীমের দু'টি আয়াত (সূরা আল-মায়েদার ৭৮-৭৯ আয়াত) তিলাওয়াত করেন: ইসরাঈল সন্তানদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল, একারণে যে তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেছিল। তাদের মধ্যে সংঘটিত অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। তাদের এই আচারণ ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كَلَّا وَاللهِ لَتَأمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أو لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ »

"মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎ কর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকে হাত ধরে বাধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন।" [108]

---

[104] তিরমিযি,আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ,সনদ সহীহ

[105] আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, পৃ:২২

[106] তিরমিযী, হাসান সূত্রে

[107] আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, পৃ:২২

[108] আবু দাউদ, সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য

পাপ ও অভিশাপ অর্জন [109]

আদেশ-নিষেধের দায়িত্বে অবহেলাকারী নিজে পাপ না করেও অন্যের পাপের কারণে গোনাহ ও লা'নতের অংশীদার হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا»

"অচিরেই তোমাদের ওপর অনেক শাসক-প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না) সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।" [110]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُقْتَلُ فَإِنَّ اللعْنَةَ تَنْزِلُ على مَنْ حَضَرَهُ حِيْنَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ ولا تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُضْرَبُ مَظْلُومًا فَإِنَّ اللعْنَةَ تَنْزِلُ عَلى مَنْ حَضَرَهُ»

"যখন পৃথিবীতে কোনো পাপ সংঘটিত হয় তখন পাপের নিকট উপস্থিত থেকেও যদি কেউ তা ঘৃণা করে বা আপত্তি করে তবে সে ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির মত পাপ মুক্ত থাকবে। আর যদি কেউ অনুপস্থিত থেকেও পাপটির বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে বা মেনে নেয় তাহলে সে তাতে উপস্থিত থাকার পাপে পাপী হবে।" [111]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُقْتَلُ فَإِنَّ اللعْنَةَ تَنْزِلُ على مَنْ حَضَرَهُ حِيْنَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ ولا تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُضْرَبُ مَظْلُومًا فَإِنَّ اللعْنَةَ تَنْزِلُ عَلى مَنْ حَضَرَهُ»

"যেখানে কোনো মানুষকে হত্যা করা হয় সেখানে কখনই দাঁড়াবে না, কারণ সেখানে উপস্থিত লোকেরা যদি তার হত্যা প্রতিরোধ না করে তাহলে সকলের ওপর লা'নত ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। আর যেখানে কোনো মানুষকে অত্যাচার করে মারধর করা হয় সেখানে দাঁড়াবে না। কারণ, উপস্থিত সকলের উপরেই লানত-অভিশাপ বর্ষিত হয়। [112]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন,

«لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالاً ثُمَّ لا يَقُوْلُهُ فَيَقُولُ اللهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ فَيَقُولُ وأَنَا أَحَقُّ أَنْ يُخْشَى»

"তোমাদের কেউ যেন নিজেকে ছোট মনে না করে। সে যদি দেখে যে কোথাও কোনো বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কোনো কথা বলা উচিৎ তখন যেন সে কথা বলা থেকে বিরত না থাকে। তাহলে আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি এ বিষয়ে কেন

---

109 আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, পৃ:২৩

110 সহিহ মুসলিম

111 আবু দাউদ সনদ গ্রহণযোগ্য

112 আহামদ,তাবারানি,বাইহাকি, বাইহাকের সনদটি হাসান বলে মুহাদ্দিসরা উল্লেখ করেছেন।

কথা বলনি? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি মানুষদেরকে ভয় পেয়েছিলাম। তখন তিনি বলবেন, আমার অধিকারই তো বেশি ছিল যে, তুমি আমাকেই বেশি ভয় করবে।" [113]

সমাজের নানাবিধ প্রকাশ্য অন্যায়, যুলুম, গণপিটুনি, বেহায়াপনা, অশ্লীল নাচগান, জুয়া, খুন-খারাবী, মারামারি-দাঙ্গা ইত্যাদির নীরব দর্শক হওয়ার ভয়াবহ পরিণতি আমরা এ হাদীস থেকে বুঝতে পারছি। এ সকল ক্ষেত্রে সাধ্যমত দা'ওয়াত দেওয়ার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতে হবে। না হলে দ্রুত এরূপ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার ও অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার তাওফিক দান করুন।

শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় [114]

এখন আমাদের ভাবার বিষয় হলো এই শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় কি ? কি আমাল করলে আমরা এই আজাব থেকে বাঁচতে পারবো, এর সমাধান আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার কালামে পাকে দিয়ে দিয়েছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَوَ لَا يَرَوۡنَ اَنَّهُمۡ يُفۡتَنُوۡنَ فِىۡ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوۡ مَرَّتَيۡنِ ثُمَّ لَا يَتُوۡبُوۡنَ وَ لَا هُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿۱۲۶﴾

অর্থ: তারা কি লক্ষ করে না, প্রতি বছর তারা দুই একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না । [115]

উক্ত আয়াতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য পথ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তার আযাব থেকে বাঁচর উপাই দুটি: (ক) তাওবা (খ) উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করা । নিচের আয়াতটিও তার বর্ণনা দিচ্ছে,

وَ لَنُذِيۡقَنَّهُمۡ مِّنَ الۡعَذَابِ الۡاَدۡنٰى دُوۡنَ الۡعَذَابِ الۡاَكۡبَرِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۲۱﴾

গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে । [116]

اِلَّا الَّذِيۡنَ تَابُوۡا وَ اَصۡلَحُوۡا وَ بَيَّنُوۡا فَاُولٰٓئِکَ اَتُوۡبُ عَلَيۡهِمۡ ۚ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ ﴿۱۶۰﴾

অর্থ: তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে। মানুষের কাছে তা বর্ণনা কওে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। [117]

উপরোক্ত আয়াত দুটিতে বনী ইসরাইলের ওপর এই জন্য লানত দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহর আহকামকে গোপন করেছে এবং আমল বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার ছেড়ে দিয়েছিল। আজ আমাদের অবস্থাও তাই। কুরআনকে শুধু ঘরের অলংকার- সোকেসের সৌন্দর্য বানিয়ে রেখেছি । নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে গোপন করছি । এমন কতো অমুসলিম আছে যাদের সাথে প্রতিদিন এক সাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটকথা সব কিছুই হয় । কিন্তু হয় না শুধু দাওয়াতের ব্যবসা-বাণিজ্য ।

এখনোও যদি আমরা আল্লাহর শাস্তি হতে বাছতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও ওই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। যা ইউনুস (আ.) এর কাওম গ্রহণ করেছিল । তারাতো ওই জাতিই যারা নিজ নবীকে মানতে অস্বীকার করে ছিল । তবে আল্লাহর শাস্তি আসতে দেখে তাওবা করল এবং তাদের নবীর ওপর ঈমান আনলো, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং শাস্তিকে ফিরিয়ে নিলেন বললেন,

فَلَوۡ لَا كَانَتۡ قَرۡيَةٌ اٰمَنَتۡ فَنَفَعَهَاۤ اِيۡمَانُهَاۤ اِلَّا قَوۡمَ يُوۡنُسَ ؕ لَمَّاۤ اٰمَنُوۡا كَشَفۡنَا عَنۡهُمۡ عَذَابَ الۡخِزۡىِ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَ مَتَّعۡنٰهُمۡ اِلٰى حِيۡنٍ ﴿۹۸﴾

---

113 আহমাদ,সনদ সহীহ

114 আল্লাহর শাস্তি, পৃ:১৩

115 সুরা তওবা-১২৬

116 সেজদাহ- ২১

117 বাকারাহ- ১৬০

অর্থ: সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হলো না যা ঈমান এনেছে অতঃপর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা ভিন্ন। তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তুলে নেই তাদের ওপর থেকে অপমানজনক আযাব- পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত । [118]

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইলের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করেছিলেন। ওই সম্প্রদায়ের মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল । (১) শিকার কারী (জালিম) (২) মুত্তাকী অর্থাৎ যারা বিরত ছিল । (৩) বাধা প্রদানকারী । আল্লাহ তা'আলা শিকারকারী (জালিম) এবং মুত্তাকী অর্থাৎ যারা বিরত ছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, বরং তাদের আকৃতিকে বিকৃত করে দিয়েছেন এবং বাধা প্রদানকারীদের পরিত্রাণ দিয়েছেন।
এই (সুরা আরাফের ১৬৩-১৬৬) আয়াতে বিস্তারিত দেখাযেতে পারে ।

একই অর্থে একটি হাদিস আছে যা বুখারী তিরমিজীতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হলো এই, তিন তলা বিশিষ্ট এক জাহাজে মানুষ আরোহন করেছে। পানির ব্যবস্থা ছিল তৃতীয় তলায় । নিচের তলার লোকেরা পানি আনার জন্য উপরে যেত, আর সেখানকার লোকদের কষ্ট হতো এ কথা চিন্তা করে তারা এ সিদ্ধান্ত নিল যে, আমরা যদি আমাদের তলার নিচ থেকে একটি ছিদ্র করে দিই, তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে এবং ওপর ওয়ালাদেরও কষ্ট হবে না । এবার যদি ওপর ওয়ালারা এ কথা বলে বসে যে, তারা তাদের তলা ছিদ্র করবে তাতে আমাদের কি যায় আর আসে? তাহলে সকলেই ডুবে মরবে। এই মুসিবত থেকে বাঁচতে হলে নিচের তলার লোকদেরকে বাধা দিতে হবে।

আজ আমাদের অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন নয়। আমরা শিরক করতে দেখেও মুখ খুলি না, কিছু বলি না। এমন অবস্থায় আমাদের ওপরও কি আল্লাহর শাস্তি আসতে পারে না? এই জাতিকে খুবই সুক্ষ্ম ভাবে ভাবা উচিত । মোটকথা কুরআনে হাকীম এই শাস্তি থেকে বাঁচার একটিই উপায় বর্ণনা করেছে,

اِلَّا الَّذِیۡنَ تَابُوۡا وَ اَصۡلَحُوۡا وَ بَیَّنُوۡا فَاُولٰٓئِکَ اَتُوۡبُ عَلَیۡہِمۡ ۚ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۶۰﴾

অর্থাৎ লানত ও শাস্তি হতে ওই লোকেরাই বাঁচবে যারা তিনটি কাজ আঞ্জাম দেবে । (১) তওবা করবে (২) এসলাহ করবে । (৩) যেই সমস্ত আহকাম গোপন করেছে তা মানুষের মাঝে বর্ণনা করবে । [119]

স্পষ্ট থাকে যে, প্রথমে তওবা ওই অপরাধের কারণে বলা হয়েছে, যা উপরে আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে । অর্থাৎ সত্যকে গোপন করা । উদ্দেশ্য হলো যে, সামনে থেকে আমাদের ইলমকে গোপন করবোনা এবং অন্যকে হক কথা বলবো । দ্বিতীয় নাম্বারে নিজের এবং অন্যের এসলাহ করবো এবং আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করবো ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করেন। আমিন!

দা'ওয়াতের ফযীলত ও সাওয়াব [120]

সাধারণ সাওয়াব ও বিশেষ সাওয়াব

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, দা'ওয়াত, দীন প্রচার বা দীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি। আমরা দেখেছি, কাজটি মুমিনের জন্য একটি বড় ইবাদত। এ ইবাদত পালন করলে মুমিন সালাত, সাওম ও অন্যান্য ইবাদত পালনের ন্যায় সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন। অবহেলা করলে অনুরূপ ইবাদতে অবহেলার শাস্তি তার প্রাপ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, কুরআন হাদীসে দা'ওয়াত বা আদেশ নিষেধের এই ইবাদতের জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার ও শাস্তির কথা জানানো হয়েছে। পুরস্কারের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষনীয়:
১. সর্বোচ্চ পুরস্কার, ২. অন্যান্য অনেক মানুষের কর্মের সমপরিমাণ সাওয়াব ও ৩. জাগতিক গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া।

---

[118] ইউনুস-৯৮

[119] বাকারা-১৬০

[120] আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, পৃ:১৮

সফলতা ও সর্বোচ্চ পুরস্কার [121]

আমরা দেখেছি যে, দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধের দায়িত্ব পালনকারীরাই সফলকাম বলে কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে। সূরা ¬আন-নিসার ১১৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই দায়িত্ব পালনকারীর জন্য রয়েছে মহা উত্তম পুরস্কার:

﴿لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤﴾ [النساء: ١١٤]

"তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোনো কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে) যে নির্দেশ দেয় সদকা কিংবা ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে তবে অচিরেই আমরা তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করব।" [122]

দা'ঈর সর্বোচ্চ পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللهِ لأنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِنْ أنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعْم

"আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষকেও আল্লাহ সুপথ দেখান তাহলে তা তোমার জন্য (সর্বোচ্চ সম্পদ) লাল উটের মালিক হওয়ার চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে।" [123]

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন,

أمْرُ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ

"ভালো কার্যে নির্দেশ করা সদকা বলে গণ্য এবং খারাপ থেকে নিষেধ করা সদকা বলে গণ্য।" [124]

আমরা যারা সহজে মুখ খুলতে চাই না তাদের একটু চিন্তা করা দরকার। প্রতিদিন অগণিতবার আমরা সুযোগ পাই মুখ দিয়ে মানুষকে একটি ভালো কথা বলার। লোকটি কথা শুনবে কি-না তা বিবেচ্য বিষয়ই নয়। আমি শুধু বলার সুযোগটা ব্যবহার করে সাওয়াব অর্জন করতে পারলেইতো হলো। একটু ভালোবেসে একটি ভালো উপদেশমূলক কথা আমার জন্য আল্লাহর দরবারে অগণিত পুরস্কার জমা করবে। সাথে সাথে লোকটিরও উপকার হতে পারে। যদি হয়, তবে আমরা (নিম্নোক্ত) দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ পুরস্কার লাভ করব।

অগণিত মানুষের সমপরিমাণ সাওয়াব [125]

দা'ঈ, মুবাল্লিগ বা দা'ওয়াত ও তাবলীগে রত ব্যক্তির বিশেষ পুরস্কারের দ্বিতীয় দিক হলো তার এই কর্মের ফলে যত মানুষ ভালো পথে আসবেন সকলের সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব তিনি একা লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُرِهِمْ شَيئاً وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الاثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لايَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئًا».

"যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো পথে আহ্বান করে, তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পুরস্কারের সমপরিমাণ পুরস্কার সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কারের কোনো ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো

[121] প্রাগুক্ত,পৃ:১৮

[122] আন-নিসা, আয়াত: ১১৪

[123] বুখারী ও মুসলিম

[124] মুসলিম

[125] আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, পৃ:১৯

ব্যক্তি কোনো বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পাপের কোনো ঘাটতি হবে না।” [126]

মুমিন যদি কোনো একটি ভালো কর্ম করতে সক্ষম নাও হন, কিন্তু তাঁর নির্দেশনা-পরামর্শে কেউ তা করে, তবে তিনি কর্ম সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পান। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْدَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

“যদি কেউ কোনো ভালো কর্মের দিকে নির্দেশনা প্রদান করে তবে তিনি কর্মটি পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবেন।” [127]

আযাব-গযব থেকে রক্ষা [128]

দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধের দায়িত্ব পলন করার অন্যতম পুরস্কার হলো জাগতিক গযব থেকে রক্ষা পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে তা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন,

«مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدْهِنِ (الواقع) فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيْنَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أعْلاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الذِيْنَ في أَسْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الذينَ فِي أعْلاهَا فَقَالَ الذينَ فِي أعْلاهَا لا نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤذُونَنَا» فَقَالَ الذينَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا (في نصيبنا) فَنَسْتَقِي (ولم نُؤذ مَنْ فَوقَنَا) فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধিবিধান সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট এবং যে লঙ্ঘন করছে উভয়ের উদাহরণ হলো একদল মানুষের মতো। তারা সমুদ্রে একটি জাহাজ বা বজরা ভাড়া করে। লটারির মাধ্যমে কেউ উপরে এবং কেউ নিচের তলায় স্থান পায়। যারা নিচে অবস্থান গ্রহণ করল তাদের পানির জন্য উপরে আসতে হয়। এতে উপরের মানুষদের গায়ে পানি পড়তে লাগল। তখন উপরের মানুষেরা বলল, আমাদেরকে এভাবে কষ্ট দিয়ে তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। তখন নিচের মানুষেরা বলল, আমরা আমাদের অংশে বা জাহাজের নিচে একটি গর্ত করি, তাহলে আমরা সহজে পানি নিতে পারব এবং উপরের মানুষদের কষ্ট দিতে হবে না। এই অবস্থায় যদি উপরের মানুষেরা তাদের এ কাজে বাধা দেয় এবং নিষেধ করে তাহলে তারা সকলেই বেঁচে যাবে। আর যদি তারা তাদেরকে এ কাজ করতে সুযোগ দেয় তাহল তারা সকলেই ডুবে মরবে।” [129]

নবুওয়াতের নূর থেকে উৎসারিত এ উদাহরণটি ভালো করে চিন্তা করুন। সমাজের অনেক ক্ষমতাধর বা প্রভাবশালী মানুষ অনেক প্রকারের অন্যায় বা গর্হিত কাজ দেখেও প্রতিবাদ করেন না। তারা জানেন যে, তারা প্রতিবাদ করলে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নীরবতা বা তাৎক্ষণিক সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেন। তারা ভাবেন, এতে আমার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কষ্ট করছে অন্য মানুষেরা। নষ্ট হচ্ছে অন্য মানুষের সন্তানেরা। তাদের বুঝা উচিৎ যে, সমাজের এ অবক্ষয় কোনো না কোনোভাবে তাদের ও তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে স্পর্শ করবেই। এ জন্য আমাদের সকলকেই আদেশ-নিষেধের এ দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকতে হবে।

দাওয়াত সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সত্যের দাওয়াত

---

[126] মুসলিম

[127] মুসলিম

[128] আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, পৃ:১৯

[129] বুখারী,তিরমীযি

ইসলাম কাদের ধর্ম ?
আল্লাহর শাস্তি
মুক্তি কোন পথে
হিন্দু থেকে মুসলমান (আলোর পথে সিরিজ ১-৩)
হিন্দু থেকে মুসলমান (আলোর পথে সিরিজ-৪)
নবীজীর আদর্শ ও আমাদের জীবন বাস্তবতা
একটু ভাবুন
বড় দিনের উপহার
হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি
সহযোগী হও প্রতিপক্ষ হয়ো না।
নাজাতদাতা কে যীশু না ঈশ্বর ?
হাদিয়ায়ে দাওয়া
খ্রিস্টানদের প্রশ্ন মুসলমানদের উত্তর
খ্রিস্টান ভাইদের প্রতি জিজ্ঞাসা
আল কুরআনে যীশু ও খ্রিস্টধর্ম
হিন্দু মুসলিম সংলাপ
ত্রিশহাজার খ্রিস্টানের গুরু যেভাবে দ্বীনের মুবাল্লিগ
দাওয়াত সম্পর্কিত চল্লিশ হাদীস
খ্রিস্টান মুসলিম সংলাপ
তোহফায়ে দাওয়াত
দাওয়াতের ফিকির এবং আমলের ময়দান
ঈসা (আ) বান্দা না প্রভু
খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম আহমদ দীদাত
মন্তব্য সম্বলিত বাইবেল
আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর গুণাবলী
আল্লাহর দিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের বাস্তব কিছু নমুনা
আল্লাহর পথে দাওয়াত
কোনটি সর্বোত্তম দ্বীন হিন্দু ধর্ম না ইসলাম
মূর্তিপূজার গোড়ার কথা
আপনায় সমীপে আপনার আমানত
প্রচলিত খ্রিস্টবাদ কিছু প্রশ্ন- কিছু কথা
দা য়ীর আত্ম পর্যালোচনা

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Assignment prepared by-

Parvej Mahamud

Batch-1902 (201)

Roll no.- 1902174201

Islamic online Madrasah
Address- Bahrain
Bangladesh: chatkhil, noakhali

Phone – 0097336429703 (imo, whats app)

Email: parvejmahamud000@gmail.com